সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু

আলাউদ্দিন
আল আজাদ

সাহিত্যের
আগন্তুক
ঋতু

আলাউদ্দিন আল আজাদ

2256
- AAS

মুক্তধারা

প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৭৪

প্রকাশ করেছেন ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
প্রচ্ছদ এঁকেছেন ঃ
প্রাণেশ মণ্ডল
ছেপেছেন ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ।
মূল্য ছয় টাকা

SAHITYER AGANTUK RITU
By Alauddin Al Azad
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashgonj, Dacca—1
Bangladesh.
Price Taka 6·00

স্বাধীন বাংলার তরুণ
বুদ্ধিজীবীর
জন্য

সূচীপত্র

৯ আজকের আন্দোলন ও লেখক
১৩ শব্দের মধ্যে এবং শব্দকে ছাড়িয়ে
১৭ সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু
২৫ বাংলাভাষার উৎস সন্ধান
২৯ সাহিত্যের নতুন ইতিহাস
৩৩ হাজার যদি মঞ্জরী
৩৭ শিল্পীর স্বাধীনতা জল্পনা
৪২ বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব
৪৬ লেখকের নতুন বংশ
৫০ প্রতীকতা ও কাব্যনাট্য
৫৪ সাহিত্যের স্থিরবিন্দু ও ছোটগল্প
৫৭ মুক্তিযুদ্ধ ও সাহিত্য
৬১ চেতনার বিশ্বস্রোত ও সাহিত্য
৬৫ ভাষার দ্বিতীয় সংগ্রাম
৬৮ ধ্রুপদী রচনা ও চলচ্চিত্র
৭৪ তুলনামূলক সাহিত্য
৭৯ র‍্যাঁবো কিংবদন্তী
৮৪ র‍্যাঁবোর জীবন : রূপরেখা
৯৩ নতুন কবিতার ইশতেহার

সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু

আজকের আন্দোলন ও লেখক

অনর্গল রচনা আমরা চাই, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, সাহিত্যের পাকা ফসল ; যে তাজা রক্তধারা রাজপথে, শহরে, বন্দরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, ঝলক ঝলক ঝাপটা মেরেছে আমাদের বুকে ও মুখে, তা আমাদের ধমনীতে ধমনীতে, শিরায় শিরায় গ্রহণ করে বর্ষার নদীর মতো উজ্জীবিত হওয়া প্রয়োজন। পৌরাণিক বাক্‌-রীতিতে বলতে গেলে, এখন লেখক শিল্পীর যুগপৎ উর্বরতা ও সৃষ্টিশীলতার পালা। জনচৈতন্যের উত্তুঙ্গ জোয়ারই তার জন্মদাতা।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আজকে জাতির সর্বস্তরে সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ জাগরণ, তা'তে উদ্দামতা যথেষ্টই আছে, কিন্তু তবু তা মোটেই ভাবাবেগপ্রবণ নয়, বরং তা একটা সজাগ আত্মদর্শনের পল্লবে পল্লবে সুনির্দিষ্ট, সীমায়িত এবং স্পষ্ট আকৃতিসম্পন্ন। সেজন্য এই জাগরণ শুধু ঘোষণা নয়, বিদ্রোহ নয়, বিপ্লবের চরিত্রে স্পন্দমান। একদিক থেকে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা কিঞ্চিৎ অভূতপূর্ব বটে ; কারণ ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন, আইরিশ স্বাধিকার প্রয়াস, এমন কি ইংরেজ সাম্রাজ্যশক্তির বিরুদ্ধে ভারতের যে সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন, এর কোনো একটার মধ্যেই এমন সংহত ঐক্য অনুপস্থিত। সাড়ে সাত কোটি বাঙালী আজ একটি মহাবৃক্ষ। এক প্রাণ, এক শরীর। স্থান ও সময়ের এক অতি তির্যক, শুভ মুহূর্তেই এর জন্ম সম্ভব হয়েছে—যার সঙ্গে পৃথিবীর এমনি অন্য সংগ্রামের নানা রকম সাদৃশ্য অবশ্যই রয়েছে, কিন্তু তবু যা অতুলনীয়।

আজকের আন্দোলন মোটামুটি সমস্ত মতাদর্শের সম্মিলিত প্রকাশ। কিন্তু যে দুই প্রধান মতধারা, হয়তো বিচ্ছিন্নভাবে বয়ে এসে, এক খাতে মিলেছে, তা হলো গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী এবং বৈপ্লবিক সমাজবাদী ধারা। এই দুই মতাদর্শের রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কর্মসূচী সকলেরই অল্পবিস্তর জ্ঞাত। একজন লেখকের কাছে জাগৃতির বাইরের রূপটাই বিশেষ আকর্ষণীয়, সন্দেহ নেই, কারণ শিল্পকলার নিজস্ব দাবী ও স্বাধীনতা সেখানে অবলীলাক্রমে ক্ষিরণ করতে সক্ষম ; কিন্তু এ অবস্থার সীমাবদ্ধতাও স্বতঃসিদ্ধ। একজন শিল্পী হিসেবে গোটা ব্যাপারটাকে আমি শিল্পের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে ভালবাসি ; সেজন্য বলছি, যে কোনো আন্দোলনের উচ্ছলতা ও সামগ্রিকতাকে মানবভাগ্যের বৃহত্তর কাঠামোর মধ্যে ফেলে না দেখলে, আমার মনে হয়, সামূহিক ক্ষতি—যদিও এমন পরিস্থিতিতে প্রচারধর্মী রচনার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। অবিশ্যি সব লেখক একই সুরে, একই ভঙ্গিতে লিখবেন তা সম্ভব নয়, আর কাম্যও নয় ; কিন্তু সব লেখকের ক্ষেত্রে একটি জিনিস বোধ হয় সত্যি, তা হলো অভিজ্ঞতা অর্জন ও সঞ্চয়ের সজাগ চৈতন্য। ব্যক্তিভেদে এই চৈতন্যেরও স্তরভেদ থাকবে, কিন্তু আন্দোলনের মূল চরিত্র সম্বন্ধে কোনো লেখকেরই অজ্ঞতা থাকা উচিত নয়।

লেখক শিল্পীর, বরাবরের মতো, আজকেও দ্বৈত সংগ্রাম ঃ অভিজ্ঞতার সংগ্রাম এবং সৃষ্টির সংগ্রাম। এক হিসেবে দেখতে গেলে দুইই একই সংগ্রামের এপিঠ-ওপিঠ। আমাদের লেখক নিশ্চিতই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ঃ তাদের বেশীর ভাগ শিক্ষক ও চাকুরে এবং নতুন বংশ, প্রধানত ছাত্র। কাজেই দেশের ডাকে তাদের সাড়ার মধ্যেও এত তারতম্য। আজকে জাতির যে চেহারা, তা কুড়ি বছর আগে, বাংলার কোনো লেখকেরই দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েনি এমন নয়, কিন্তু তাদের কণ্ঠ ছিল স্তিমিত এবং ভূমিকা সীমাবদ্ধ। প্রতিক্রিয়ার চাপ ছিল এমনি প্রবল, তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন এবং তাদের রচনা, ক্রমে ক্রমে, রূপক প্রতীকের ছদ্মাবরণের আশ্রয় নিয়েছে। শিল্প অনন্ত এবং চিরনমনীয়, সেজন্য এমন রূপে দামী লেখার জন্ম হয়েছে। এসব লেখা সমাজ-প্রগতিকে তিলে তিলে ধারণ করেছে এবং বিন্দু বিন্দু করে জেলেছে চেতনার আগুন।

কিন্তু সজাগ চৈতন্য যদি লেখক সমাজের একটি অঙ্গীকার, তাহলে এই রচনা গুণে ও পরিমাণে আশাপ্রদ নয়, তা স্বীকার করতেই হবে। আমাদের লেখকসমাজের এই শৈল্পিক নিষ্ক্রিয়তার অনেক কারণ থাকতে পারে, যা প্রতিভার অভাব নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু উদ্যোগের অভাব, আত্মত্যাগের অভাব। এই নেতির প্রধান কারণ নিশ্চয়ই তার অপরিণত শ্রেণীমূল। আমাদের সাহিত্যে নতুন বংশ যে শূন্যতা ও আত্মসম্ভোগের সাধক, তা এই মানসিক পরিস্থিতিরই স্বাভাবিক পরিণতি। ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যে তাদের আকণ্ঠ ডুবিয়ে দিয়েছে যে সমাজব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাবে তারা এর অনুধাবনে অক্ষম, সেজন্য তারা ভাবছেন এই বুঝি জীবনের অর্থ, এই চরম নিয়তি। তাঁরা যে আত্মকেন্দ্রিক রোমান্টিকতা ও কলা-কৈবল্যবাদের রংমহলে বন্দী হয়েছেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সৃজনশীলতা কিরূপে দেখা দেবে তা সাগ্রহে লক্ষ্য করবার বস্তু, এইজন্য যে পাশ্চাত্যের হিপিতান্ত্রিক রচনাধারার অস্থিষ্টও আজ কেবল বুনিয়াদবিরোধী নৈরাজ্য নয়—বৃহত্তর-মানববিপ্লব।

লেখকের অভিজ্ঞতা আহরণের সংগ্রাম কিভাবে চলে সে সম্পর্কে শেষ কথা বলা সম্ভব নয়, তা নিঃসন্দেহে বহুবিচিত্র এবং জটিল। তবে একটি ব্যাপার তো সত্যি, পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ রচনা কোনো না কোনো ভাবে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মূলে নিহিত। কেবল একান্ত কল্পনায় ও তথ্য সংগ্রহে সামূহিক অভিজ্ঞতা শৈল্পিক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হতে পারে না। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনাচরণের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েই আহরিত অভিজ্ঞতার পরিপক্কতা সম্ভব। কাজেই আজকের লেখক জাতীয় ঘটনা-ধারার নিস্পৃহ দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না, নিজের সৃষ্টির জন্যই তাঁকে উৎসমূলে যেতে হবে, তাতে অবগাহন করতে হবে, হতে হবে জাতির আত্মার সঙ্গে একাত্ম। তাঁর ব্যক্তিসত্তা জাতিসত্তায় নিমজ্জিত হয়েই হবে নৈর্ব্যক্তিক। সেজন্য তাঁর কাজ এক দুরূহ সাধনা। মানবজীবন, সমাজ ও শিল্পগত সর্বাত্মক এক তাত্ত্বিক প্রস্তুতি ছাড়া তার পক্ষে এই দুরূহ পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এই প্রস্তুতি অনেকের পক্ষে সহজাত,

আর অনেকের পক্ষে অর্জনের জিনিস। লেখক যদি মানবসমাজ ও জীবনের চরম গন্তব্য সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারেন এবং সে পরিণতিতে থাকে তাঁর বিশ্বাস, তাহলে এক সময়ে কোনো আন্দোলনের অনুপস্থিতি কিংবা ব্যর্থতা তাঁর সৃষ্টিধারাকে ব্যাহত করতে পারে না। এক আন্দোলন ব্যর্থ হবে, কিন্তু তা রেখে যাবে অন্য আন্দোলনের বীজ। সবকিছুতে জড়িত থেকেও তিনি মহৎ শিল্পের জন্য অপরিহার্য দূরত্ব স্থাপনে সক্ষম হবেন। প্রতিভাবান শিল্পীর সৃষ্টির সংগ্রাম আসলে অনন্ত এবং অবিচ্ছিন্ন।

মার্চ ১৭, ১৯৭১

শব্দের মধ্যে এবং শব্দকে ছাড়িয়ে

শিল্পীমাত্রই যোদ্ধা। এবং যোদ্ধা হিসেবে সাহিত্য-শিল্পীর শক্তি প্রায় অপরিমেয়। তার দু'টি কারণ—প্রথম, লেখকের প্রতিপক্ষ, সে নির্দিষ্ট কোনো বুনিয়াদই হোক কিংবা হোক অনির্দিষ্ট-পরিমাণ প্রতিদ্বন্দ্বী, তার বিশ্লেষণী ও অন্তর্দৃষ্টির সামনে তাদের সমস্ত বিশেষত্ব, শক্তি ও দুর্বলতা নিয়ে উপস্থিত হতে বাধ্য ; এবং দ্বিতীয়ত তার অস্ত্র সর্বাত্মক এবং অফুরন্ত। লেখক যাকে ঘায়েল করতে চান তার বাঁচবার উপায় নেই। আমি একজন রসিক নাট্যকারকে জানি, যার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করলে, তিনি তার নাটকের চরিত্র বানিয়ে ছেড়ে দেবেন বলে হুমকি ছাড়েন। তার ব্যবহার বোধগম্য, আসলে, যে কোনো ভালো রচনার বিষেয় তো লেখকের একান্ত মনগড়া জীবন নয়, যদিও বাস্তবের নমুনাটি আরো বহু উপাদানে সংলগ্ন ও মিশ্রিত হয়ে পায় সম্পূর্ণতা। আর যেহেতু তার অস্ত্র শব্দাবলী, সেজন্য কখনো তার অস্ত্রাভাবের ভয় নেই এবং এই অস্ত্রের মারণ-ক্ষমতাও অব্যর্থ, কারণ এই অস্ত্র বিশেষ ব্যবহারের শর্তে সীমাবদ্ধ নয়।

শব্দের মধ্যে, শব্দের অস্ত্রে লেখক সুসজ্জিত এবং নিজের অস্ত্র দিয়ে যে যুদ্ধ করে সেই তো প্রকৃত যোদ্ধা। কিন্তু এরও ব্যতিক্রম আছে। ইতিহাসের এমন একেকটি মূহুর্ত আসে, হয়তো জাতীয় জীবনের সন্ধিক্ষণ কিংবা মানবতার সংকট, যখন লেখক শিল্পীর সত্তা দোলায়িত হয়

কোনো মহত্তর আহ্বানে, যার প্রচণ্ডতা তাকে আরো কিঞ্চিৎ এগিয়ে যেতে বাধ্য করে, আর তখনই কডওয়েল কিংবা লরকার আবির্ভাব। তখন শব্দের অস্ত্র নিমজ্জিত হয় সারা চেতনায় তার হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে এসে ধরা দেয় যা মূক মারণাস্ত্র। এর সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত, নাৎসীবিরোধী সংগ্রামে সারা ইউরোপ ও সোভিয়েটের শত শত লেখকের অগ্রগামী ভূমিকা। লোকায়ত্ত চীন প্রজাতন্ত্র স্থাপনে অগুন্তি লেখকের কর্মকাণ্ডও এখানে স্মরণীয়।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, তা হোলো, মুক্তিসংগ্রামের সর্বাগ্র বাহিনীতে রাইফেল হাতে এগিয়ে যাওয়া একজন লেখকের পক্ষে কতখানি সমীচীন যখন তিনি পেছনে বা গণসমাজের মাঝখানে থেকে আরো ফলপ্রসূভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করতে পারেন? এর জবাব সহজ। জিনিসটা লেখকের চেতনার গুণগত পরিমাণের ওপরে নির্ভরশীল। কোনো জাতি যখন মুক্তিসংগ্রামে আন্দোলিত, তখন তা সমাজের স্তরে স্তরে যে উৎক্ষেপ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে তার যে-কোনো অংশই রচনার উপাদান হওয়ার উপযোগী ঃ অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা অনুসারে একেক লেখক একেকভাবে তার রূপায়ণ করতে পারেন; এমনকি, পশ্চাৎপদ কিংবা প্রতিক্রিয়া ভাগের চিত্রণও হবে গ্রহণযোগ্য যদি তা থাকে সামগ্রিক গন্তব্যের দৃষ্টিকোণে নিবদ্ধ। এবং বলা বাহুল্য, এই চরিত্রের লেখকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, কারণ ঔপনিবেশিক দেশে মধ্যবিত্তরাই বুদ্ধিজীবী এবং তাদের একটা বিরাট অংশ নীতিগতভাবে সংগ্রামকে গ্রহণ করলেও, নানা সমস্যা ও দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তারা সক্রিয়। কাজেই সংগ্রামের অগ্রবর্তী দলের অঙ্গীভূত লেখকের সংখ্যা সব দেশেই অল্প। যারা তদ্দূর যেতে পারেন তাদের প্রত্যেকেই উৎসর্গীকৃত-প্রাণ রাজনৈতিক কর্মী। তারা প্রথমে বিপ্লবী, পরে শিল্পী। বিপ্লবই তাদের লক্ষ্য, সাহিত্য সেই লক্ষ্য অর্জনের উপায়। একটা কবিতা লেখার চাইতে একটি শত্রুকে হত্যা করা তার কাছে বেশী দামী।

এই লেখক যেহেতু বিপ্লবী এবং একরকম ভূমিকায় অবতীর্ণ, সেজন্য নিশ্চয়ই তিনি শ্রদ্ধাভাজন। তার প্রাগ্রসর অভিজ্ঞতা, কখনো কখনো

সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করতে পারে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু, মনে হয়, তাকে ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য করাই ভালো। বিপ্লব সাধন করার চাইতে বিপ্লবকে ধারণ করা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সেইজন্য সর্বপর্যায়ে লেখকের কাজের প্রয়োজন। এর দুটো ধারা থাকতে পারে—এক, সমীক্ষণ এবং দুই, সৃষ্টি।

মানব সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন এক গুণগত উত্তরণ, সেজন্য এই পরিবর্তনের কালে, মূল্যায়ণের মনোবৃত্তিকে সজাগ রাখা দরকার। এ এমনি এক মুহূর্ত, যখন যে-কোনো চরমের মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা, যার অদূরদর্শী অচেতন লক্ষ্য ধ্বংস, কেবল ধ্বংস। পুরনো সমাজের সবকিছুই মন্দ নয়, মন্দ ছিলো না। পুরনো সাহিত্য সবটাই নয় আবর্জনা; পুরনো মূল্যবোধের সবটাই নয় ধিক্কারজনক। আসলে, মানব-সমাজের আবহমানকাল থেকে, যা কিছু উত্তম যা কিছু সুন্দর ও মহৎ, তাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তার পরবর্তী বিকাশই তো বিপ্লবের অন্যতম লক্ষ্য। মানব-সংস্কৃতিকে যে ধ্বংস করতে চেয়েছিলো তার নাম ফ্যাসিবাদ, যার পুনরাবৃত্তি কোনো দেশে কোনো কালেই আর কাম্য নয়। সেজন্যই বলছি, যুগসন্ধিক্ষণে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, চোখ-কান খাড়া রাখতে হবে, যাতে যুগে যুগে কালে কালে অর্জিত আমাদের মানস-সম্পদকে না হারাই। এই সমীক্ষণের আরেকটি দিক সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতির ইতিহাসের পুনর্গঠন, পুনর্লিখন। এই কাজে পণ্ডিতমণ্ডলী ও গবেষকের যে দায়িত্ব, তাও অত্যন্ত গুরুতর।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে মূলনীতি, তা হবে লেখকের সর্বাধিক স্বাধীনতা, যদিও জাতিবিরোধী ও গণবিরোধী ন্যূনতম প্রয়াসও চলতে দেওয়া হবেনা। কবি কবিতা লিখুন, হোক তা অন্তর্মুখী স্বগতোক্তি, এমনকি ভাষার জটিলতম আবহ, তবু তা গ্রহণীয়, যদি কোনো না কোনোভাবে তা আমাদের চেতনাকে প্রসারিত করে, আত্মাকে করে উজ্জীবিত, কিংবা, এমনকি বিষণ্ণ; ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারকে কেবল অগ্রগামী সংগ্রামের চিত্রই আঁকতে হবে এমন কোনো কথা নেই, যদিও সেই দুর্লভ

শিল্পখণ্ড যিনি আমাদের দেবেন তিনি হবেন আমাদের গৌরবের পাত্র ; আমরা চাই যেটুকু যার ক্ষেত্র ও গণ্ডী তার মধ্যে তার অভিজ্ঞতার পূর্ণতা, পরিপক্কতা—যার ফল হবে, আঙ্গিক যাই হোক, অখণ্ড সৃষ্টি। এই নতুন দশকের যিনি লেখক তিনি আত্মতৃপ্ত শোভন এক রূপকার মাত্র হোন তা আমরা চাই না। আমরা চাই, তিনি দুর্জয়ের সাধনা করুন, তিনি হোন অসন্তুষ্ট, বিরক্ত, রক্তাক্ত ; তার মধ্যে এসে সম্মিলিত হোক সাধকের অবিরাম আত্মত্যাগ ও শিল্পীর সৃজনশীল কারুশীলতা। আত্ম-উৎসরণে কি নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণে তার গন্তব্য হোক বিশ্বের কেন্দ্রে সূর্যের নীচে সাম্য-মৈত্রী স্বাধীনতার অবিরাম স্রোতোধারায়, প্রবাহে প্রবাহে এক তৃষ্ণার্ত ক্ষুধার্ত অপরাজেয় মানবতার।

শব্দের মধ্যে এবং শব্দের বাইরে সব অবস্থায় লেখকের কর্তব্য অনবরত নির্মাণ। যখন নির্মাণ করবেন না তখন চলবে নির্মাণের পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি এবং সেও তো নির্মাণের ধারা। প্রাচুর্যও শক্তিমান শিল্পীর সংবিধান।

মার্চ ২২, ১৯৭১

সাহিত্যের আগন্তুক ঋতু

রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাহিত্যেরও কি হয় নবজন্ম? প্রশ্নটা, অন্তত বাংলাদেশের বর্তমান পটভূমিতে, খুবই প্রাসঙ্গিক ; এবং আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের বিভিন্ন কোণে মাঝে মাঝে তা উচ্চারিত হয়ে চলেছে প্রমাণ পাই। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা যে নতুন অবস্থায় এসে পড়েছি তাতে ধর্মকর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার নবমূল্যায়ণ অত্যন্ত জরুরী, যার অভাবে নৈরাজ্য ও শুন্যতা অনিবার্য ; এবং অন্তত এদিক থেকেও আমাদের সাহিত্যের অন্তর্নিহিত সমস্যা ও লক্ষণগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই যা সামনে তার উত্তর, রাষ্ট্রবিপ্লব মূলত রাজনীতি এবং সাহিত্যবিপ্লব বলতে যা আমি বোঝাতে চাই তা মূলত সৌন্দর্যতত্ত্ব, এবং যদিও এ দুয়ের পরস্পর সম্পর্ক, কখনো কখনো, অবিভাজ্যও হতে পারে, কিন্তু সাধারণত একের শীর্ষবিন্দু অন্যের চরম পরিণতি নয়। বিপ্লব এক ধরণের বিস্ফোরণ, শ্রেণীদ্বন্দ্বের সংকটে যার জন্ম ; অজ্ঞানতার পর্যায় থেকে অগ্রগামী চেতনা পর্যন্ত একটি প্রবাহ আছে, এটা হতে পারে প্রস্তুতিকাল যখন শিক্ষার পর শিক্ষা অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতার উৎক্রান্তি : সাহিত্যকে যাঁরা শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার মনে করেন এই আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে সমতালে, এমনকি কখনো বা অগ্নিশিখার মতো সে চলবে এই তাঁদের দাবী। তাঁদের মতে, সব সাহিত্যই প্রচারধর্মী, কোনটা স্থূল, আর কোনটা সূক্ষ্ম

এই যা তফাৎ; তাই তরঙ্গের সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পারা হয় অক্ষমতা নয় প্রতিক্রিয়ার পিছুটান। এই মতবাদের কতখানি সত্য তা বলা মুশকিল; তবে এইটুকু মনে হয়, অতটা যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শিল্প-সাহিত্যের বিচার অসম্ভব। সমাজ রূপান্তরের দুটি পথই আছে এক ক্রমবিবর্তন, দুই অভ্যুত্থান: কিন্তু একথাও ঠিক ক্রমবিবর্তন অভ্যুত্থানবিরহিত নয়, এবং অন্যপক্ষে অভ্যুত্থানও নয় ক্রমবিবর্তনহীন। আসলে দুইংই বিমিশ্রিত এক জটিল প্রক্রিয়া; যখন যেটা প্রাধান্য লাভ করে তখন তাকে চিহ্নিত করাই আমাদের অভ্যেস। এই আলোড়ন-বিলোড়ন উদ্ভাসন-পরিবর্তনের যে কোনো শিকড় কাণ্ড পত্রগুচ্ছকে অবলম্বন করেই মহৎ সৃষ্টি হতে পারে এবং একেকটা মহৎ রচনাই তো একেকটা সাহিত্যবিপ্লব?

এই অখণ্ড পরিণত রচনা কেমন করে সংঘটিত হয় তা প্রাকৃতিক রহস্যের মতোই দুর্বোধ্য, যদিও অনেকে অনেক রকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। একি একান্ত ব্যক্তি-প্রতিভার দান? অথবা, এলিঅটের ভাবনা-অনুযায়ী, ভাষা, সাহিত্য, সভ্যতা ও ব্যক্তিমানস এই চতুর্মাত্রিক পরিপক্বতারূপী শুভক্ষণের আকাঙ্ক্ষিত ফল? আমরা জানি না। কোন্ জাতিত্ব কত হাজার বছরে এ রকম প্রসবক্ষম হয়ে ওঠে তাও অস্পষ্ট। গোটা ইংরেজ ইতিহাস বিবর্তিত হয়েছে কি এলিজাবেথের কালে একজন শেক্সপীয়রকে জন্ম দেওয়ার জন্য? এবং রবীন্দ্রনাথকে সম্ভব করার জন্য বাংলার ইতিহাস?

বাঙালীর স্বাধীনতাযুদ্ধকে যারা সংলগ্ন পঁচিশ বছরের বঞ্চনার অনিবার্য পরিণতি ভাবেন তাঁরা আংশিক ঠিক, বরং বাঙালীর স্বাধীনতাযুদ্ধ হাজার বছরের বাংলার ইতিহাসেরই একটি উত্তুঙ্গ মুহূর্ত যা প্লাবনের মতো বয়ে নিয়ে এসেছে বহুস্রোত, বহু পলিমাটি, বহু সম্ভাবনার উর্বরতা; এবং এই বিপুল উপকরণের সারমর্ম ট্র্যাজেডি। চরম বিচারে অজানা অনন্তের মধ্যে মানব-অস্তিত্বটাই পরম ট্র্যাজিক, শুধু ব্যক্তি নয়, জাতি হিসেবেও, কারণ ব্যক্তির মৃত্যু তো অবশ্যম্ভাবী, জাতি হিসেবেও মানব-অস্তিত্ব চিরস্থায়ী কিনা সন্দেহ আছে। অবশ্য অন্তিম ধ্বংস সম্পর্কে অতিসচেতনতা নিষ্প্রয়োজন, সে মহাপ্রলয়ই হোক, হোক

কেয়ামত, কিংবা এক প্রবল টানে পৃথিবীর সূর্যের জঠরে প্রবেশ অথবা সূর্যের তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর বরফের গোলায় পরিণতি ; কিংবা মানব-তৈরী বৈজ্ঞানিক বিস্ফোরণে বিলুপ্তি। কিন্তু মুহূর্তে মুহূর্তে যে যন্ত্রণা ক্ষয় ও মৃত্যু : সেখানেই ট্র্যাজেডির বীজ। কাজেই ট্র্যাজেডির আবিষ্কার মানে জীবনেরই আবিষ্কার। ট্র্যাজেডি জীবন, জীবন ট্র্যাজেডি। লেখক রচনা করেন অনেককিছু, কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য ট্র্যাজেডি, ঈগলের দৃষ্টি যেমন পর্বতের উচ্চতম চূড়ার দিকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে হাসি-ব্যঙ্গের মিলনের রচনা কি বড় নয়? হতে পারে কখনো কখনো, কিন্তু তারও জন্য চাই শিল্পীর অস্থিমজ্জায় জীবনের ট্র্যাজিক চেতনা। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ট্র্যাজেডির অধ্যায় নেই কিন্তু করুণরসের মূল্যায়ণ আছে যদিও করুণরস ট্র্যাজেডি নয় বরং করুণরসের থেকে উত্তরণই ট্র্যাজেডির অন্যতম রূপ। কিন্তু ট্র্যাজেডি শব্দটাকে এখানে আমি ব্যবহার করছি এক পরিণত শৈল্পিক পরিমাপের ভিত্তিমূল হিসেবে, একটা সুনির্দিষ্ট শিল্পরূপ হিসেবে নয়, যদিও তাও এর অন্তর্গত ; বাংলাদেশ ট্র্যাজেডি অভিজ্ঞতার যে নতুন ভূসংস্থান করেছে তা এক গুণগত মৌলিক পরিবর্তন যার জাগরণে পুরনো লেখকরা ঝরে পড়ে গেছেন এবং বিভাগোত্তরকালের কেবল সেই তরুণই এখনো সক্রিয় তৎকালেই যাদের রচনায় ছিলো ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও প্রতিধ্বনি ; এবং যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের কালকে বিন্দু বিন্দু করে পেরিয়ে এসেছেন। এঁদের সংখ্যা নগণ্য, যদিও দৃশ্যমান। অবশিষ্ট নতুন বংশ যারা ষাটের দশকের গোড়া থেকে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছেন। এদের এসথেটিক্স মূলত নব রোমান্টিসিজম : যার বৈশিষ্ট্য প্রকাশবাদ, অস্তিত্ববাদ কি অতিবাস্তববাদ নয় বরং এক অপার ব্যক্তিময়তা ; এই রচনা ভাবে শূন্যতামুখী এবং রূপে কাব্যধর্মী। এই শূন্য কখনো ব্যঙ্গোক্তি, কখনো বিষাদ। কখনো যন্ত্রণা, আবার কখনো শুধু ভাষার স্তম্ভায়ন। বাস্তবতার সর্বায়তনিক রূপ এদের আকর্ষণ করে না। এই সাহিত্য, ক্রমান্ধ জীবনের প্রতি, লোকহিতের এমনকি ভাষায় সৌন্দর্য সৃষ্টির ধারণা তার কাছে অনাবশ্যক—এবং এক পরম

নাস্তির মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ। এই তরুণ বংশের দ্বিতীয় স্তর একটা আছে, যারা কিঞ্চিৎ আস্তিক এই দিক থেকে যে তারা সাহিত্যকে হয়তো ফরাসী প্রতীকবাদের লোকশ্রুতির প্রভাবেই, অন্তত কাগজে কলমে, আত্মোপলব্ধির মাধ্যম মনে করেন। সাহিত্য, তাদের কাছে যার অর্থ কবিতা, শব্দের হাশিশ, একান্তে ভোগ করার জিনিস—মানব তৈরীর রসায়ন নয়, এমনকি নয় বিশ্বদর্পণ। তরুণ বংশের একটা ক্ষীণ তৃতীয় স্তরও অল্পবিস্তর লক্ষণীয় প্রগতিশীল বামপন্থী উপাদান যাদের মধ্যে উপস্থিত। বাংলা সৃজনশীলতার উপরিউক্ত পট ইতিমধ্যেই আমাদের উপহার দিয়েছে কিছু নিপীড়িত জ্বলন্ত রক্তাক্ত সম্ভার এবং এটুকু আশাপ্রদ, কিন্তু অসামান্য নয়ঃ আমাদের সাহিত্যে তরুণ বংশ তার মধ্যবিত্ত সংকটের প্রাকারে বন্দী, যাকে ভেঙে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না বাইরে যেখানে জীবনের অনন্ত নাট্যলীলাঃ আপন অস্তিত্বের চারপাশে তন্তুজালের রচনা করেছে গুটিপোকার মতো, কিন্তু খোলসের ভিতরে আপন মৃত্যুতে সোনালী আঁশের অবদান রেখে যেতে সে অক্ষম। এই শ্রেণীসম্মোহের কারাগার তার ভাঙা চাইঃ আমরা শিল্পীরা একেবারে শ্রেণীহীন হয়ে যাবোঃ শ্রেণীহীন কিন্তু বৈরাগী নয়, বিপ্লবী। ঘোষণা করছি আমরা কোনো শ্রেণীর মুখপাত্র নই, প্রতিনিধি নই—নইকো পরিচয়ঃ আমরা অখণ্ড অপরাজিত মানবতার আত্মার রূপকার। আমরা এক অবিচ্ছিন্ন সাহিত্য-বিপ্লবের সৈনিক; সৃষ্টি করছি এক অমৃত উৎস যেখানে অনবরত স্নান করে মানুষ পাবে সঞ্জীবতা। বিশ্ব যদি সত্যিই নিরর্থক, আমাদের সংগ্রামশীলতাই আধারের অর্থ। মানব আমাদের প্রথম গন্তব্য, কিন্তু মানবেতর অন্বেষণও আমাদের কাম্য কারণ বিশ্ব অনন্ত এবং অনাবিষ্কৃত। যা কিছু মানুষের স্বাধীন সত্তা, অবাধ আত্মপ্রকাশকে শৃংখলিত করে আমরা তার বিরুদ্ধে, হোক তা রাষ্ট্রযন্ত্র, হোক তা কোনো মতবাদ। এবং মানবজাতির কল্যাণ শান্তি সমৃদ্ধি ও প্রগতিই আমাদের নীতির মূলভিত্তি। এই সমস্ত এবং এমনি আরো অনেক কিছু ধারণের উচ্চারণের উদ্ভাসনের যোগ্যতার মধ্যে এনে ফেলেছে আমাদেরকে বাংলার গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধ; এ এক অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ, যা একটা ক্ষুদ্র জাতির বিষয় হয়ে থাকেনি হয়েছে

বরং সারা মানব-জাতিরই পটে অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর অভিযানের প্রতীক : সেজন্য এটা হয়তো অতিরঞ্জন নয় যে, সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে আজকের বাংলাদেশের কবি ফরাসী কি ইংরেজ কি মার্কিন পৃথিবীর যে কোনো দেশের কবির চাইতে অনেক অগ্রবর্তী বিন্দুতে অবস্থিত : উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাই, ছোটগল্প এবং নাটকের ক্ষেত্রেও।

এই সম্ভাবনা, আমার মনে হয়, বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন পালাবদলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এলিঅট দেখিয়েছেন সাহিত্যের গতিধারার মধ্যে একটা দোলকবৃত্তি লক্ষণীয় : গদ্যময়তা থেকে সাঙ্গীতিক এবং সাঙ্গীতিক থেকে গদ্যময়তার মধ্য দিয়ে সে চলে। কথাটা বুঝতে পারি। এমনিতেও একটানা গান শুনতে আমাদের ভালো লাগে না, গানের পরে চাই কঠিন কিছু জিনিস। এক সময় মিঠা ভালো লাগে, আরেক সময় কড়া। এবং এই লক্ষণটা যদিও মনে হবে শৈলীগত আসলে তা নয়, কারণ বিচ্ছিন্নভাবে অস্তিত্ব থাকলেও সেই রূপ তার শৈলীর মূলত ভাষাতাত্ত্বিক : শৈলীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্ধাতু ব্যক্তি ও জাতির ঐতিহ্যগত ও সমাকালীন চৈতন্যের সঙ্গেই বিজড়িত; অতএব সাহিত্যে কঠিন-কোমলের যাওয়া-আসা উপরোক্ত মনীষী যেমন বলেছেন অতটা যান্ত্রিক নিশ্চয়ই নয়; বরং আমার ধারণা, দুটো ধারাই এক সঙ্গে চলে এবং পর্যায়ক্রমে একেকটার থাকে প্রাধান্য। আসলে সাহিত্যধারার মৌলিক, গুণগত পরিবর্তন বেশ ধীরে ধীরে আসে : এ যেন কতকটা বড়ো কোনো নদীর বাঁক নেয়ার মতো, অনেক বছর ধরে রৌদ্রে-বৃষ্টিতে বর্ষায়-প্লাবনে আস্তে আস্তে ভাঙতে ভাঙতে গড়তে গড়তে সে নেয় নতুন গতিপথ; এবং তার সমস্ত অবয়বে সে পূর্ববর্তী সময়ের চিহ্ন ও রং বহন করে চলে যা নতুনের ছোঁয়ায় জাগ্রত অভিনব এবং কখনো কখনো অপূর্ব কিন্তু সম্পূর্ণ অচেনা নয়। একটি নতুন চেতনা, একটি নতুন দৃষ্টিকোণ সব কিছুকে রাঙিয়ে দেয়, সঞ্জীবিত করে। বাংলা সাহিত্যে ঊনিশ শতকের শেষ অর্ধাংশ তেমনি এক বাঁক পরিবর্তনের কাল, যখন মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক জীবনায়নের মধ্যে রেনেসাঁর বিচিত্রিত স্রোতোধারা নানা ছিদ্রে নানা ফাটলে প্রবেশ করে গোটা সাহিত্যকে নতুন জীবনীশক্তিতে, নতুন

পরিচ্ছদে সাজাতে লাগলো। ইংরেজী সাহিত্যে ক্ল্যাসিকাল যুগের যুক্তিবাদ ও পরিমিতির প্রতিক্রিয়ায় রোমান্টিসিজমের আবির্ভাব তেমনি এক পালাবদল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম রচনা মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশের (১৮৬১) পর একশ বছর অতীত হয়েছে ; এবং প্রতি একশ বছর পর পর সাহিত্যের নবমূল্যায়ণের যে প্রস্তাব, সেদিক থেকেও আমরা এখন এক মৌলিক পরিবর্তনের ধারায় এসে পড়েছি। এই মতবাদ মেনে নিলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠবে রবীন্দ্রনাথে ভাববাদী এসথেটিক্সের পরিণতির পরে যে বাস্তববাদের জন্ম তা এখন অনুর্বর এবং দোলকবৃত্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা কি এখন ঝুঁকেছি আরেকটি ভাববাদী এসথেটিক্সের দিকে ? এ সম্পর্কে এক্ষুণি নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়, তবে এ কালের কবিতা গল্প নাটক উপন্যাস ও সমালোচনার ভাবভঙ্গি বিশ্লেষণ করলে মনে হয় এটা সত্য : এখন নীরবে হাওয়াবদল চলছে, এবং শুকনো পাতা ডালপালা গাছগাছড়ার মধ্য দিয়ে শুনতে পাই এক নতুন আগন্তুক ঋতুর প্রতিধ্বনি। দুই-একটি পুষ্পস্তবক, লাজুককণ্ঠ কোকিল দেখছি। একি পুরাতনেরই পুনরাবৃত্তি ? সেই রোমান্টিসিজম যার মূলে কঠিন আদর্শবাদ ? না, তা মোটেই নয়। যে ধারা চলে যায় তা কখনো আর পূর্ব রূপে আসে না ফিরে : শিল্পকলার ক্ষেত্রে তো নয়ই, বরং বলা যায় ধরনটা শুধু চেনা বাকী সব নতুন, এক মৌলিক রূপান্তর। সাহিত্যের ঝোঁক এখন প্রতীকতা যার মূলে এক সর্বায়তন বাস্তববাদ ; এবং বিবর্তনের ধারার মধ্য দিয়েই আমরা এই অন্তঃস্রোতের কাছে এসে পড়েছি। কিন্তু একটি সতর্কবাণীও ঝুলছে বাগানের সামনে, অনুর্বরতার নাম অপমৃত্যু এবং গণজীবনই উর্বরতার উৎস। কাজেই শিল্পকলাকে আত্মবিলাসের জন্য ব্যবহার করার শাস্তি অন্য কেউ বহন করে না, করেন স্বয়ং শিল্পী। সে শাস্তির নাম অসাফল্য, ধ্বংস।

জনগণই উৎস, জীবনের, অফুরন্ত প্রেরণার। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের এই নতুন পালাবদলের কালে নতুন করে তার আবিষ্কার অপরিহার্য। সেখানে যেতে হবে, আবগাহন করতে হবে, ডুব দিতে হবে। কারণ সেখানেই উর্বরতা ; মণিমুক্তা রত্নখনি।

অভিজ্ঞতা গণচৈতন্য ভাণ্ডার, তার ক্ষেত্র যাই হোক না—ব্যক্তি জাতি কি মানবতা; কিন্তু তার মানে নয় লোকরীতির অন্ধ অনুকরণ, কিংবা বৈদগ্ধ্যের বিসর্জন। আসলে এর নন্দনতাত্ত্বিক তাৎপর্য কি তা আমরা বিশ্লেষণ করে দেখবো, যদিও এসম্পর্কে শেষ কথা বলা হয়তো কখনোই সম্ভব হবেনা।

সাহিত্য-আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে এগুতে এগুতে দেখা যাক না কি পাই।

প্রথমে কবিতার মধ্যেই আসা যাক। আমি বলবো, শ্রেষ্ঠ কবিতা সর্বদাই নিমজ্জন, যদিও তার হয়তো একটা সীমারেখা আছে। ফরাসী কবি কিশোর র‍্যাঁবোর কাছে কবিতা ছিল শব্দের রসায়ন, কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি পরমকে ছুঁতে চেয়েছিলেন, পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাষার একটা রূপ আছে যা অন্তত এতটুকু সীমাবদ্ধ যে সে চরম ঊর্ধ্বায়িত রূপের অনন্তকে ধারণ করতে অক্ষম। র‍্যাঁবো পেলেন না, মাত্র উনিশ বছর বয়েসে চিরতরে সাহিত্য পরিত্যাগ বুঝি তাঁর সেই আশাভঙ্গেরই ফল? ভালেরী তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' রচনা করবার জন্য কুড়ি বছর অপেক্ষা করলেন; কিন্তু তা লেখা হোলো কই? ভাষা অসাধ্য সাধন করতে পারে; কিন্তু সে নয় অলৌকিক।

এই সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রকৃত কবিতা নিমজ্জন, অন্তর্যাত্রা। কথা উঠবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্য তো সমাজচিত্র মাত্র, বহির্বাস্তবতার বিস্তারিত রূপায়ণ? এমন কি রাষ্ট্রনীতি, ধর্মতত্ত্ব নীতিমালা এটা ঠিক; কারণ প্রাচীন সমাজে, সামূহিক মানুষই ছিলো সত্য। মহাকাব্য গাথা ও উপাখ্যান তাকে রূপ দিয়েছে চিত্রমালা সাজিয়ে সাজিয়ে। হ্যাঁ এটা মূলধারা স্বীকার করি এবং এখানেও এক ধরনের নিমজ্জন আছে। কিন্তু নিমজ্জনই যেখানে কবিতা, এর মধ্যেও তার ধ্বনি কি আমরা কিছু শুনতে পাইনি? সাফোর কবিতা তাহলে কি? কি তাহোলো রাজা সোলেমানের প্রেমগাথা? চণ্ডীদাসের পদাবলী?

নিমজ্জনের প্রকৃতি আমাদের বোঝা চাই। কবি ও সাধকের মধ্যে তফাৎ এই যে, সাধক নিমজ্জিত হন, অন্তর্যাত্রা করেন এবং আর ফিরে আসেন না। কিন্তু কবি নিমজ্জিত হন, অন্তর্যাত্রা করেন এবং আবার ফিরে আসেন। কবির এই প্রত্যাগমনের নামই কবিতা।

নিমজ্জন দুই প্রকৃতির : প্রথম, লেখকের আত্মবিলোপ বহির্বাস্তবতার মাঝে যার ফল মহাকাব্য গাথা উপখ্যান ; নাটক উপন্যাস। এবং দ্বিতীয় প্রকারের নিমজ্জন আন্তরিক দাহ, ক্ষত ও তৃষ্ণার রূপায়ণ যার নাম প্রধানত গীতি ও প্রতীক কবিতা।

প্রথমক্ষেত্রে ভাষা, ছন্দ ও সঙ্গীত জনসমক্ষে ঘটনাদ্বারা পরিবেশনের মাধ্যম, কিন্তু দ্বিতীয়ক্ষেত্রে ভাষা, ছন্দ ও সঙ্গীতই কবিতা।

প্রথম ধারার গতি ছবির দিকে, দ্বিতীয় ধারার গতি সঙ্গীতের দিকে।

আধুনিককালেও প্রথম রীতি নিঃশেষিত হয়নি, তার প্রমাণ বিশ শতকের গোড়ার দিকে রূপকল্পবাদী আন্দোলন (Imagist Movement)। উত্তর তিরিশের বাংলা কবিতাও মোটামুটিভাবে এই বিশিষ্টতা মণ্ডিত।

সমকালীন বাংলা কবিতা প্রতীকতার দিকে ঝুঁকেছে, সুতরাং তা দ্বিতীয় নিমজ্জনেরই লক্ষণাক্রান্ত, অতএব এই নিমজ্জনকেই আগে বোঝা প্রয়োজন। প্রতিভা ও কবিভেদে বিভিন্ন রূপ আসবে ; কিন্তু তিনটি সম্ভাব্য স্রোতের কথা আমরা বলতে পারি। প্রথম, আবহমান মানবচৈতন্যের ধারায় নিমজ্জন, দ্বিতীয়ত, মরমিয়তার ধারায় এবং তৃতীয়ত প্রতিদিনকার চলমান চিত্রের সঙ্গে ভাসমানতা।

এখন এই শেষোক্ত রূপের মরশুমই যেন চলছে। আমাদের প্রায় সব তরুণ কবিই শিক্ষিত এবং ছাত্র ; যে নাগরিক সমাজের মধ্যে ওরা বাস করছেন, তার প্রতি তাদের অনাস্থা এবং সেইজন্যই ব্যঙ্গ বেদনা বিষাদ। এই আশাভঙ্গের অনুভূতি কি সাময়িক বিকার অথবা জীবনেরই মৌলিক ট্র্যাজেডির স্বীকৃতি ? একটা গণ্ডির ভিতরে থেকে ওঁরা নকশা আঁকছেন এবং তা কখনো কখনো বিচিত্র এবং সুন্দর সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রচণ্ডতা ও নিবিড়তা নতুন কবিতার জন্ম দেবে, তার উৎস গণ-চৈতন্য, যে রূপময় হয়ে ওঠে প্রতীকে রূপকে নানাবিধ বিমূর্ততায়। সেখানেই আছে হাহাকার ; সেখানেই আছে মরমিয়তা, অপার বজ্র বিদ্যুৎ ও অন্ধকার। আছে প্রেম। ঘৃণা, নানা ক্ষুধা। মানবীয় আদিমতার মধ্য দিয়েই আসছে যে নতুন ঋতু তাকে আমি চোখ ভরে দেখতে চাই।

১৯৭২

বাংলাভাষার উৎস সন্ধান

বাংলাভাষার জাতি কি, হঠাৎ উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্তু প্রশ্নটা এখন অনিবার্য; কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদেরকে এমন এক শর্তের মধ্যে এনে ফেলেছে যেখান থেকে আমাদের অস্তিত্বের উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে আমরা বাধ্য। সব স্তরে খুঁজতে হবে গোড়া। নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক; সামাজিক, ঐতিহাসিক। এক্ষেত্রে ভাষা-গবেষণার প্রশ্নটি সবচেয়ে গুরুতর এইজন্য যে, বাংলাভাষা আমাদের চৈতন্যের সিঁড়ি এবং এই ভাষা এখন শুধু পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহৎ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষাই নয়, এই ভাষা তেরো কোটি মানুষের মুখের বুলি।

বাংলাভাষার জাতিত্ব সম্পর্কে ধ্রুপদী সিদ্ধান্ত হোলো, প্রাচীন ভারতীয় আর্য কথ্যভাষার পূর্বরূপ থেকে তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ। আর্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ঋক্‌বেদ আনুমানিক প্রায় দেড়হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দকালে রচিত হলেও পাঁচশ' বছর পরে হাজার খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের দিকে সংকলিত হয়েছিলো। এই বৈদিক সাহিত্যের তিনটি ভাগ—বেদ বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ। ব্রাহ্মণ বেদের ব্যাখ্যা এবং উপনিষদ তার পরিশিষ্ট। ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ দুইই প্রধানত গদ্যে রচিত। বেদ মূলত ধর্মসাহিত্য। এ ছাড়া আরেকটি সাহিত্যিক ভাষার অস্তিত্বও আমরা দেখতে পাই, যা'তে অবৈদিক ও লোকায়ত গল্প উপাখ্যান রচিত হয়েছে; এবং তার নাম 'সংস্কৃত'। কেউ-কেউ বলেন, সংস্কৃত বৈদিক ভাষার 'সরলীকৃত রূপ'; কিন্তু অন্যদের মতে, সংস্কৃত অনার্য-আর্য ভাষার বিমিশ্রণে উৎপন্ন কথ্যভাষার শিষ্ট, মার্জিত রূপ যা'কে পাণিনি ব্যাকরণের শৃংখলে আবদ্ধ করেন এবং যা রাজকার্য, রাজসভা ও সাহিত্য রচনায় ব্যবহৃত হতে থাকলো।

এখানেই আমাদের প্রথম জিজ্ঞাসা—যে মিশ্র, প্রাকৃত বা জনগণের ভাষার কথা পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন সে ভাষার মূল কাঠামো কি কি ছিলো ? আর্য অথবা অনার্য ? কোনো বিদেশী জাতি একটা দেশকে যখন জয় করে তখন সে সেই জনপদের মাটির ভাষাকে হটিয়ে দিতে পারে কিনা তার জবাব খুব কঠিন নয় ; এবং তা হোলো, বিজিত জাতি আর যাই হোক, প্রাকৃতিক নিয়মেই মাতৃভাষাকে বিসর্জন দিতে পারে না। বৈদিক ও সংস্কৃতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে সে কথাটাও এখানে স্মরণীয়। অতএব এমনো হতে পারে যে, প্রাকৃত ভাষাগুলো আসলে আর্য-আগমনের কালে ভারতের বিভিন্ন জনপদে প্রচলিত কথ্যভাষারই নামান্তর। আর্য আগমন করে এগুলোতে আর্য উপাদান প্রবেশ করেছে ; এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চাপ ও সঞ্জীবন এমনই ব্যাপক যে, তা'দেরকে আর্যভাষা ব'লে ভুল হয়। বাংলাকে আর্যভাষা বলে চিহ্নিত করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ঋক্‌বেদে বাংলাদেশ অনুল্লেখিত ; কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আর্যাবর্তের সীমানার বাইরে গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী জাতিকে বলা হয়েছে দস্যু। কিন্তু মহাকাব্যের যুগে দেখতে পাই, একজন বঙ্গরাজা অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন।

বাংলাদেশের প্রতি আর্যদের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের পরিচয় তাদের লেখার সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এর কারণ নিশ্চয়ই বাংলার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাস্পৃহা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে লেখা আর্যমঞ্জুশ্রীকল্পে গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকদের বলা হয়েছে 'অসুর' ভাষাভাষী। তখন পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গ ছিলো গৌড় ; এবং পুন্‌ড্র উত্তর বঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম আসাম। 'অসুর' ভাষাকে পণ্ডিতেরা 'অষ্ট্রিক' বুলি বলে চিহ্নিত করেছেন। উপরিউক্ত ভৌগোলিক সীমানার ভিতরে সমগ্র প্রাচীন বাংলা রয়েছে, বলা যেতে পারে। সুতরাং আমরা সহজেই বলতে পারি অষ্টম শতাব্দী পর্যন্তও বাংলার কোনো অঞ্চলই আর্য ভাষা প্রচলিত হয়নি, যদিও সোয়া তিনশ' থেকে সাড়ে ছ'শ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার বহুরাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে এসেছিলো। কিন্তু সমতট বা মোটামুটি, পূর্ববঙ্গ বহুকাল আর্য অধিকারে আসেনি ; এবং ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধে সে তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে।

এখানে বিস্তারিত ইতিহাস পর্যালোচনার অবকাশ নেই ; সংক্ষেপে শুধু এই বলবো যে, বহু আক্রমণ, উত্থান-পতনের মধ্যেও বাংলা, বিশেষ সমতট, বঙ্গ পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ বরাবর তার স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা করেছে। আর্যদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল পশ্চিম বঙ্গ বা গৌড়। এবং রাজকার্য শিক্ষা ও সাহিত্যে তারা সংস্কৃত ভাষাই ব্যবহার করত। তবে, বিজিত হোলেও গৌড়ের প্রাচীন অধিবাসীরা তাঁদের ভাষা বিসর্জন দিয়েছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই ; সুতরাং গৌড়ী প্রাকৃত আর্যভাষা এবং তা থেকে বাংলাভাষার জন্ম এও একটা সরলীকরণ এবং বৃহৎ অনুমান মাত্র।

উনিশ শতকে কলকাতায় সমাগত ইংরেজ পণ্ডিতেরা বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা বলতেন। তাঁদের মনোভাবের ভিত্তি ছিলো মধ্যযুগের কয়েকটি কাব্য ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বক্তব্য। এবং এই মনোভাব আজকের দিন পর্যন্তও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আমাদের শ্রদ্ধেয় পূর্বাচার্যরা কঠিন গবেষণার বন্ধুর পথে না গিয়ে ইউরোপীয়দের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন। বাংলাভাষার শব্দ সমূহের সংস্কৃত মূল নির্ণয় তেমনি এক হাস্যকর প্রয়াস। আর্যীকরণের মোহ তাঁদের এমনিভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁরা অবলীলাক্রমে সংস্কৃত ব্যাকরণকেই বাংলার উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। শুনতে হয়তো আশ্চর্য লাগবে কিন্তু এ কথা ঠিক যে, এখনো পর্যন্ত বাংলাভাষার কোনো ব্যাকরণ নেই।

সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলাভাষার মিল অতি সামান্য। উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানত শব্দভাণ্ডারের জন্যই বলা হয় সংস্কৃত থেকে বাংলার উৎপত্তি। অথচ ওই সমস্ত বিশেষজ্ঞের হিসেবেই বাংলাভাষায় সংস্কৃত মূলীয় শব্দের সংখ্যা মাত্র শতকরা পঁচিশ থেকে তিরিশভাগ ; এবং আটভাগ বিদেশী শব্দ। বাদবাকী শব্দগুলোর উৎস কি? এ সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে তাঁরা মিনমিন করেন—জোর দিয়ে কিছু বলতে যেন বড়ই লজ্জা। কোনো কোনো শব্দকোষে শতকরা পঁচিশভাগ 'দেশজ' শব্দ দেখান হয়েছে ; কিন্তু এই হিসেবের অবলম্বনও পুঁথি, প্রচলিত কথ্য ভাষা নয়।

বাংলাভাষা ধ্বন্যাত্মক শব্দের এক মহারত্নভাণ্ডার এবং শোঁ শোঁ শন্ শন্, ঝন্ঝন্ এমনি হাজার হাজার শব্দ রয়েছে, সংস্কৃতে যার চিহ্নও নেই। নদীনালা ধানশস্য গ্রামবন্দরের বহু নাম এখনো প্রাচীন।

বাক্যরীতিই একটা স্বতন্ত্র ভাষার প্রধান মাপকাঠি ; অথচ বাক্যরীতিতে সংস্কৃত ও বাংলা অনেক দূরবর্তী বিন্দুতে অবস্থিত। সংস্কৃত বাক্যরীতি একেবারে জমজমাট ; এখানে পান থেকে চূন খসবার জো নেই। প্রত্যেক শব্দের সুনির্দিষ্ট স্থান আছে বাক্যে ; কিন্তু বাংলা বাক্য বেশ নমনীয়। বাংলা বিভক্তিও সংস্কৃত থেকে আসেনি ; যে দু'একটার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখানো হয়, তা কষ্টকল্পনা।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমার মূল প্রতিপাদ্য হোলো, বাংলা ভাষার উৎস জাতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের জন্য আজকে সম্পূর্ণ নতুন গবেষণার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাঙালী জাতির মতো বাংলাও বেশ বিমিশ্রিত ভাষা ; কিন্তু তবু বাংলা কি বঙ্গভাষা নয় ? গৌড়ী বা পূর্বী প্রাকৃতই যদি তার ভিত্তি হয় তবে সেকি ছিলো আর্যভাষা অথবা বাংলার আর্যপূর্ব প্রাচীন ভাষারই সমকালীন রূপ ?

নতুন গবেষণার কয়েকটি প্রাথমিক সূত্র : (১) একদিকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং অন্যদিকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপজাতীয় ভাষা, মাঝখানে বাংলাকে রেখে তাঁদের বাক্যরীতি, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দগত তুলনামূলক বিচার ; (২) নেপালী তিব্বতী চৈনিক কিংবা বর্মী ভাষার মধ্যে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের কোনো প্রাচীন উপাদান অনুলিখিত আছে কিনা সে সম্পর্কে অনুসন্ধানকরণ আর্য আক্রমণ ও ব্রাহ্মণ্য শাসনের সময় আত্মরক্ষার্থে এরকম চলাচল স্বাভাবিক ছিলো ; (৩) সমতটীয়, মানে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও দ্বীপাঞ্চলের বর্তমান গণবুলির নতুন বিশ্লেষণ এবং তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আদি বঙ্গভাষার অন্বেষণ।

এই মৌলিক ও দুরূহ কর্তব্য সাধনের জন্য প্রয়োজন সরকারী অর্থপুষ্ট একটি আলাদা গবেষণা সংগঠন। তার পরিচালনায় একটি গবেষকমণ্ডলী সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন। তাছাড়া, এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগকে সমন্বিত করাও হবে তার দায়িত্বের অঙ্গ। আমি এর নাম দিতে চাই, জাতীয় বাংলা গবেষণা পরিষদ।

১৯৭৩

সাহিত্যের নতুন ইতিহাস

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে কোন জাগরণের অর্থ তার অস্তিত্বের অন্তর্গত সবকিছুর নব মূল্যায়ন।

কোন সাংস্কৃতিক যুগই চিরস্থায়ী নয় ; একটা সাংস্কৃতিক উদ্ভব ও ক্রম-পরিণতি অনেকটা সময় ধরে সংগঠিত হতে পারে কিন্তু এক স্তরে এসে তার অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী যার মধ্যে লুকানো থাকে নতুনতর সাংস্কৃতিক যুগের ধ্বনি প্রতিধ্বনি। এবং ক্রমে ক্রমে, তার থেকেই জন্ম নেয় নতুন প্রেক্ষিত। তখন নতুন যুগের দর্শন দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচির আলোকে গোটা ঐতিহ্যকে উদ্ভাসিত ও পুনর্বিন্যস্ত করে নেয়া এই একই সৃষ্টিশীলতারই অঙ্গ। স্মরণীয় কালের ইতিহাসে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার স্বাদ আমাদের এই প্রথম ; সুতরাং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত নিয়ম আরো বেশি করে সত্য।

সাহিত্যের নব মূল্যায়ন দু'টি ক্ষেত্রে সাধিত হতে পারে—সমালোচনা এবং ইতিহাস।

অবশ্য সমালোচনা ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন নয় ; কিন্তু সমালোচনা যে মূলত নন্দনতত্ত্ব একথাও ঠিক।

সমালোচনা অন্য প্রবন্ধে আলোচ্য, এখানে ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, আমাদের নতুন সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস লিখতে হবে।

প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, নতুন ঔপনিবেশিক শাসনের বিগত পঁচিশ বছরে আমাদের ইতিহাস-চিন্তা অসংগঠিত ছিলো এবং সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি ও বন্ধ্যাত্বই যে তার কারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সময়ে একটি ক্ষেত্রে

কিছু কাজ হয়েছে যার গুরুত্ব স্বীকার্য : কোলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী যাকে সাম্প্রদায়িক ব'লে উপেক্ষা করেছে কিংবা মনে করেছে তাদের শিল্পমূল্য সামান্য অতএব সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখিত হওয়ার অযোগ্য—সেই সমস্ত লেখক ও তা'দের রচনাবলীর বিবরণ বিলম্বে হলেও, মূল্যবান। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাংলা সাহিত্যের কথা', মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', মুহম্মদ মনসুর উদ্দিনের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', মুহম্মদ আবদুলহাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', আবু সুফিয়ান নাজিরুল ইসলামের 'বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস', কাজী আবদুল মান্নানের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা', গোলাম সাকলায়েনের 'মর্সিয়া সাহিত্য' এবং আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য'—এই পুস্তকগুলো অল্পবিস্তর বিশিষ্টতা আর বৈচিত্র্য নিয়েও, একই পরিধির মধ্যে পড়ে বলে আমার ধারণা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রয়াসের তৎকালীন মূল প্রবণতাটি এখানেই স্পষ্টতর হয়ে ফুটেছে যদিও এঁদের সিদ্ধি তথ্য দলিলের আবিষ্কার ও শ্রেণীকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, যদিও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ এবং বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গবেষক, তবু তাঁর ইতিহাস আমাদের প্রত্যাশাকে সন্তুষ্ট করে না : তার ইতিহাস, প্রকৃতপক্ষে ক্ষীণসূত্রে গাঁথা বিচ্ছিন্ন গ্রন্থাবলী। এমনো হতে পারে যে, লেখকের একটি পূর্ণ নকশা আঁকা ছিলো মনে, কিন্তু এই সমস্ত সুদীর্ঘ সময় ধরে প্রকাটিত হতে থাকে যার মধ্যে লেখকের মনোভাবের উত্থান-পতন ঘটা স্বাভাবিক এবং পরবর্তী কালে সামঞ্জস্য সাধনের সময়াভাব হেতু বিশৃঙ্খল বিবরণের মধ্যেই ওই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কীর্তি নিঃশেষিত হয়েছে। তবু তাঁর একটি বিশেষত্ব, দৃষ্টির অবারিত মাত্রা, যার অন্য নাম দেওয়া যেতে পারে, ঔদার্য। সাহিত্য মাত্রই, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান, যে কারুর রচিত হোক না তার কাছে শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসার সামগ্রী এবং যা কিছু বাংলা তাই তাঁর নিজস্ব সম্পদ। বিশ্বাস ও জ্ঞান সাধনায় এই দ্বৈত অস্তিত্বধারী পুরুষ রচনা সিদ্ধিতে পরিমিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের ইতিহাস-ভাবনার একটি প্রেরণাস্থল হতে পারেন বটে।

বাংলাদেশ এখন স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র; কাজেই তার বিকাশের ধারা স্বাতন্ত্র্যের অভিমুখী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এখানে একটি মৌলিক প্রশ্ন, আমাদের ইতিহাস-চিন্তার পরিধি থেকে পশ্চিমবঙ্গের কাজ কি বর্জনীয়?

এর জবাব সহজ। প্রথম, পুরাকাল থেকে উনিশ শ, সাতচল্লিশ সাল পর্যন্ত আবহমান বাংলা সাহিত্য, আইন রাজনৈতিকভাবে পৃথক হোলেও, দুই বাংলারই সাধারণ সম্পত্তি; দ্বিতীয়ত উনিশ শ, সাতচল্লিশ সন থেকে দুই বাংলার সাহিত্যই দু'টি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, যদিও উভয়ের মধ্যে ভাষা ও লিখনশৈলীগত সামঞ্জস্য প্রাকৃতিক নিয়মেই লক্ষ্ণীয় এবং একটার কেন্দ্র কোলকাতা, অন্যটার ঢাকা। বিভাগোত্তর কালের স্বতন্ত্র ধারা দু'টি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরেও অব্যাহত থাকবে যতদিন না প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষার ভিত্তিতে বৃহত্তর অখণ্ড বাংলা। তবে সেই সুদূর ভবিষ্যতেও সাহিত্যকেন্দ্র হিসেবে দুই মহানগরীর অস্তিত্ব থাকা অসম্ভব নয়, এমনকি তারা পৃথক রীতিরও জন্ম দিতে পারে যেমন অতীতে ছিলো বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী।

আজকে বাংলাদেশে আমরা যারা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস লিখবো তা'দের সামনে দু'টি প্রধান কর্তব্য: এক, চর্যাপদের পূর্ববর্তী অন্তত হাজার বছরের হারানো বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধান এবং সে সম্পর্কে বিজ্ঞান-সম্মত তাত্ত্বিক পটভূমি তৈরী; এবং দুই, চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ইউসুফ জোলেখা, এক কথায় প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক নিদর্শন হিসেবে যে সমস্ত রচনাকে আমাদের পূর্বাচার্যরা চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন. নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে তার পর্যালোচনা। কারণ আমার আশংকা হয় যে, ওঁদের বিন্যাসের মধ্যে বহুরকম ফাঁক ও ফাঁকি বর্তমান।

বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাসের আরেকটি গুরুতর দিক, পদ্ধতি। আদর্শ সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু তথ্যনির্দেশ নয়, আরো দুটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন – বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন।

সামাজিক-রাজনৈতিক পটে লেখকের জীবনবৃত্তান্ত কিংবা লেখার উৎস, যত প্রসঙ্গই আসুক না, বিশ্লেষণের মধ্যে অবশ্যই থাকবে বৈজ্ঞানিকের

সত্যপ্রীতি ও নিস্পৃহতা। সাহিত্যের ইতিহাসকার কোনো বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী হতে পারেন, এবং আধুনিক কালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটা প্রত্যাশিত; কিন্তু বিশ্লেষণে তিনি সেই মতবাদ দ্বারা অতিমাত্রায় আচ্ছন্ন হলে ইতিহাস ভাবপ্রবণ অথবা খণ্ডিত হতে বাধ্য।

সাহিত্যের ইতিহাস সাধারণত চার প্রকৃতির দেখতে পাই—বিবৃতিমূলক, নন্দনতাত্ত্বিক, মনস্তত্ত্বধর্মী এবং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী। বর্তমানকালে তুলনামূলক সাহিত্য-ইতিহাস রচনারও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

বলাবাহুল্য, বিচ্ছিন্নভাবে এর প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ। কেবলমাত্র বিবরণে একটা স্থুলত্ব আছে যা সাধারণ পাঠকদেরই চাহিদা মেটাতে সক্ষম, আবার ঐকান্তিক রসবাদী বিচারের দুর্বলতা অনির্দিষ্ট প্রসার ও অনিমিতি, অনুরূপ শুধু ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তন শ্রেণীসম্পর্ক, শ্রেণী-সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক বিন্যাসের আলোচনা শিল্পকলার মূল্যায়নে যথেষ্ট নয় কারণ শিল্পবস্তু সবচেয়ে মানবিক, সামঞ্জস্যপরায়ণ অথচ জটিলতর সামগ্রী। তেমনি একান্ত মনস্তত্ত্ব ব্যক্তিপ্রাধান্য রচনা করে অথচ ইতিহাসে জগৎচিত্রই তো মুখ্য?

উপরিউক্ত পদ্ধতিসমূহ, আমার মনে হয়, আনুপাতিক সুমিতি ও সৌষম্যে, মূল্যবোধ নিরীক্ষায় একটি নিটোল সঙ্গীতের মতো সমন্বিত হোলেই আমরা সেই প্রজ্ঞাখণ্ড পেতে পারি যার নাম সাহিত্যের ইতিহাস। একমাত্র এইভাবেই রূপময় হয়ে উঠতে পারে পুষ্পস্তবকাকীর্ণ ফলভারনত পরিণত বৃক্ষ যার মধ্যে বিজড়িত বৈজ্ঞানিকের ব্যবচ্ছেদ, দার্শনিকের তত্ত্বজ্ঞান এবং কবির অন্তর্দৃষ্টি ও ভালবাসা। এমনি একটি বৃক্ষই হতে পারে নতুন নতুন ঋতুর জন্মদাত্রী।

১৯৭৩

হাজার যদি মঞ্জরী

বায়ান্নর রক্তাক্ত ফাল্গুন বাংলাভাষা গাছের গোড়ায় একটি উর্বর উৎস, যা বহুকাল ধরে জোগাতে পারে সঞ্জীবনী রস ; বিন্তু সত্যই আমাদের লক্ষ্য হাজার যদি মঞ্জরী, তাহলে এই উংসের উপস্থিতিটাই শেষ কথা নয়। বায়ান্নর স্রোতোধারা আমাদের বিপুল বেগে বয়ে নিয়ে এসেছে একাত্তরে, যার উপরে ভাসতে ভাসতে পেয়েছি স্বাধীনতার সূর্যোদয়। কিন্তু এর জন্যও রক্তসাগর পেরোতে হোলো, এও বোধ হয় একই অঙ্গীকার। উৎস থেকে সাগর সৃষ্টির এই তো নিয়ম, তবে কখনো তা ঘটে কখনো ঘটে না। আমাদের ক্ষেত্রে ঘটেছে, আমরা ভাগ্যবান বৈকি।

এইটুকু প্রায় প্রাকৃতিক ঃ কিন্তু উৎসকে ধারণ করতে হবে, উৎসকে বাঁচাতে হবে। এটা বাঙালী হিসেবে, আমাদের কর্তব্য।

কর্তব্যের সঙ্গে জড়ানো পরিকল্পনা ও প্রজ্ঞা ; বড় হয়ে বাঁচতে গেলে ভাবাবেগেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারী যেন কেবল রুটিন অনুষ্ঠান ও বাগাড়ম্বরের মঞ্চ না হয়ে পড়েঃ আমরা কথা বলবো, অনেক কথা এমনকি মাঝে মাঝে পরস্পর-বিরোধীও ; কিন্তু এক জায়গায় থাকতে হবে স্থির। কর্তব্য সাধনে পাষাণ-প্রতিম।

স্বাধীন বাংলা প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বাংলাভাষার সম্ভাবনার অপার দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে ; কারণ ভাষা মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম পরস্পর মনোভাব বিনিময়ের উচ্চারণ ; কিন্তু এই ভাষার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি নির্ভর

করে সেই জনগোষ্ঠীর কর্মসাধনার উপর। ইতিহাসে অনেক ভাষা মরে গেছে কারণ সেইসব জাতিও কালে কালে হয়েছিলো মৃতপ্রায়। অপর পক্ষে, মৃতপ্রায় ভাষাও হয়েছে জীবন্ত যখন এসেছে সংশ্লিষ্ট জাতির মধ্যে নবচেতনা, পুনর্জাগরণ। এটা ঠিক। স্বাধীনতাও এমন এক শর্ত, যা মানুষকে কিঞ্চিৎ সম্প্রসারিত করে; এবং আমাদের ক্ষেত্রেও তা সত্য। এখন বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা; ক্রমে ক্রমে সর্বস্তরে তা প্রচলিত হয়ে যাবে তা ঠিক, যেমন অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়ত, সমস্ত পৃথিবীর দিকে আমরা এখন সরাসরি মুখ তুলে তাকাতে পারছি; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অনেক দেশের সঙ্গে ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে কূটনৈতিক সম্পর্ক। এক্ষেত্রেও ভাষার আদান প্রদানটা স্বাভাবিক।

এগুলো চলবে; কিন্তু ভাষার পূর্ণাঙ্গ বসন্তের জন্য আরো বেশি কিছু প্রয়োজন।

এবং তার নাম সচেতন প্রয়াস, কঠোর সাধনা। ক্রমবিকাশের ধারায় বাংলাভাষা এখন এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেচে যেখানে সে অত্যন্ত নমনীয় এবং শস্যগর্ভ; একে দিয়ে যে-কোন জিনিস আমরা বানাতে পারি, বুনতে পারি যে-কোন ফসলের বীজ। চাই শুধু ইচ্ছে, চাই জাগ্রত বাসনা। আগুনের মতো জ্বলতে পারা চাই। সচেতন প্রয়াসের অন্যতম দিক একটি সুষম প্রকাশক্ষম শক্তিশালী ব্যবহারিক ভাষা সংগঠন। তা আছে আমাদের, এখন শুধু চিহ্নিত করবো। আঁকবো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ নকশা, রূপরেখা। এখানে দু'টি প্রধান ধারা—দর্শনমূলক এবং বিজ্ঞানমূলক রচনা। উভয় ধারার জন্যই পরিভাষা নিরূপণ অপরিহার্য। এবং এর জন্য আমাদের অর্জন করতে হবে একটি আধুনিক ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি। মনে রাখতে হবে মানব সমাজ ক্রমেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠছে: সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক পরিভাষা আমাদেরকে তা'দের জন্মস্থান থেকেই গ্রহণ করতে হবে এবং তা কখনো গ্রীক কখনো লাতিন। কখনো জার্মান, কখনো ইংরেজি। কখনো ফারসী, কখনো রুশ। দ্বিতীয়ত, আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ও ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক বিদেশী শব্দ চলতি আছে যেগুলো এখন বাংলা ভাষার অঙ্গ; এদেরকে ঝেটিয়ে দূর করতে হবে, তার

কোনো মানে নেই। ফাইলকে নথি না করলেই নয়? বরং ফাইলও চলুক নথিও চলুক – যেটা টেকবার, টিকবে; এবং যে পারবে না, চলে যাবে অভিধানের অন্ধকার কোণে। একই চিহ্ন কিংবা ভাবপ্রকাশে একাধিক শব্দ থাকা ভাষার সম্পদ; এবং যে ভাষা যত বেশি বিদেশী শব্দ ও প্রকাশ-ভঙ্গি আত্মস্থ করতে পারে সে তত বেশী ধনী।

আসলে ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে বাংলা ইংরেজী ফরাসী জার্মান ভাষার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য নয়, এবং সৃষ্টির ভাষা হিসেবেও সে ওদের প্রায় সমকক্ষ।

ওসব ভাষার কৃতিত্ব অনেক বেশি এজন্য যে, জাতি হিসেবে ওই ভাষা-ভাষী জনসমাজ সভ্যতা গড়ে তুলেছে; জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে করেছে অক্লান্ত সাধনা। করেছে নতুন নতুন গবেষণা, নতুন নতুন আবিষ্কার। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় জন্মেছেন বলে অনেক বিদেশী বাংলা শেখেন, আমরা দেখেছি; কিন্তু বাংলাদেশে যদি নিউটন, আইনস্টাইন, মাদাম কুরী জন্মগ্রহণ করেন তাহলে বাংলার প্রতি সারা পৃথিবীরই আরো বেশি দৃষ্টি পড়বে না কি? মৌলিক গবেষণা লিখতে হবে বাংলাভাষায় এবং সত্যই যদি নতুন কিছু থাকে তাতে, তাহলে সে-ই কাজ করবে চুম্বকের মতো।

ক্ষমতা প্রাচুর্য বৈচিত্র্য: শিল্পকলার মতো ভাষারও সিদ্ধি এই ত্রৈমাত্রিক সৃজনশীলতায়।

প্রতিভাবান লেখকের হাতে বিশেষ বিশেষ রচনায় ভাষা ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে; কিন্তু ভাষার আসল ক্ষমতা সেইখানে যেখানে আপামর জনসাধারণও সহজেই গণ্ডিভুক্ত। তার মানে, কোনো ভাষার ক্ষমতা তার সার্বজনীন মান। কথ্যভাষা ও সাহিত্যভাষা সেখানে পরস্পর বিজড়িত এবং নিরন্তর সঙ্গমশীল। বর্তমানে আমরা দেখছি, বাংলা সাহিত্য-ভাষা গণবুলি থেকে বেশ দূরে সরে এসেছে, এটা সংকটের লক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্য-ভাষা ও বাংলাদেশের সাহিত্য-ভাষার মধ্যে, পাকিস্তান আমলে, আরবী উর্দু'র প্রতি ঝোঁকের দরুন যে সামান্য পার্থক্য দেখা দিয়েছিলো, তা এখন আর নেই; কিন্তু দুই সাহিত্য ভাষাই নতুন সঞ্জীবনের

মুখাপেক্ষী। লেখ্য ভাষার কাঠামো যে এক হয়ে গেছে তা দুর্লক্ষণ নয়, বরং বাংলার অতীত ও ভবিষ্যৎ অখণ্ডত্বেরই প্রমাণ। কাঠামো ঠিকই থাকবে; কিন্তু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর বৈদগ্ধ্যের বেড়াজাল থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে, যেতে হবে জনতার কাছে।

এবং ভাষার প্রাচুর্য সমগ্র জাতির বিশাল ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডেরই সরব প্রকাশ। শ্রম ও উৎপাদন তার ভিত্তি। শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনে, কলে কারখানায়, মাঠে ময়দানে যে গুঞ্জন, তা অতীতকে যেমন গেঁথে তোলে তেমনি ভবিষ্যতের পানে তার যাত্রা।

প্রাচুর্যের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় বৈচিত্র্য, যার অর্থ বহুমাত্রিকতা। আসলে ক্ষমতা প্রাচুর্য বৈচিত্র্য, তিনটা গুণই পরস্পর বিমিশ্রিত; তবু যখন আলাদা করে দেখি, তখন বৈচিত্র্য যেন ভাষার নানা রং, নানা চিত্র। এবং মূলত তা সমকালীন লিখনরীতিরই বিভিন্ন ধারা-উপধারা। একটা নির্দিষ্ট যুগে সাহিত্য-ভাষা ব্যবহারের একটি মূলপ্রবাহ থাকতে পারে, যা প্রকৃতপক্ষে সেই যুগের বৈশিষ্ট্য নির্ধারক, কারণ ভাবনার পার্থক্যকে যে ধরে রাখে তার নামও ভাষা। কিন্তু এই স্রোত একটা সাধারণ কাঠামো মাত্র; তার ভিতরে, সাহিত্যের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে ভাষার বিভিন্ন রূপ ধরা পড়াটা স্বাভাবিক। যেমন প্রবন্ধের ভাষা, উপন্যাসের ভাষা: এক ভাষা নয়, যদিও কোনো জায়গায় দু'য়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মিল সম্ভব। কবিতার ভাষা, নাটকের ভাষা, মূলত পৃথক। অবশ্য কাব্যনাট্যে দু'য়ের সামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এবং এটাও ঠিক যে, সমকালীন রুচি অনুসারে সাহিত্যের যে মাধ্যম প্রাধান্য লাভ করে, তার প্রভাব পড়ে অন্যান্য মাধ্যমের উপর।

এবং এরই মধ্যে লেখকের ব্যক্তিগত শৈলী বৈচিত্র্যের মণিমুক্তা, যেখানে আমরা পাই নানা শিখা। অতএব ভাষার হাজার মঞ্জরী ব্যক্তিরসেই রসায়িত; কিন্তু জাতীয় প্রতিভার উর্বর ভূমি ছাড়া সে ফুটতে পারে না, বাঁচতে পারে না।

১৯৭০

শিল্পীর স্বাধীনতা জল্পনা

রাষ্ট্রবিপ্লবের পর স্বাধীন বাংলাদেশে শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নটি যে নতুন ক'রে জেগেছে, এটা স্বাভাবিক। আমরা এখন এ বিষয়ে ভাবছি, আলাপ-আলোচনা করছি ; এর প্রধান কারণ নিশ্চয়ই আমাদের মূল্যবোধসমূহের নববিন্যাসের আকাঙ্ক্ষা। বহু রক্ত ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছি তা কোনোভাবে খর্ব বা বিকৃত হোক তা আমরা চাই না, সেজন্যই তার নিরাবেগ পর্যালোচনারও এখন উপযুক্ত সময়। বহু পুরাতন শিল্পীর স্বাধীনতা প্রশ্নটি, যাহোক খর্ব করার এক ক্লাসিক দৃষ্টান্ত গ্রীক দার্শনিক ও চিন্তানায়ক মহামতি প্লেটোর মতবাদ, যা আদর্শ রাষ্ট্রে কবির অবস্থান নিষিদ্ধ করেছিলো। প্লেটোর মস্তিষ্ক যে মহৎ কল্পনাই থাক তাঁর বক্তব্য যে সরাসরি শাসকশ্রেণীর কাজে লেগেছে তা বলাই বাহুল্য। কবিরা আবেগের উদ্‌গাতা সেজন্যই বিপজ্জনক। নিজের মতকে বিসর্জন দেওয়ার পরিবর্তে যিনি বিষপানে মৃত্যুবরণের পথকেই বেছে নিলেন সেই বীরোত্তম সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্যের ভূমিকা আমাদের কাছে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু বেদনাদায়ক। এবং এটা প্রাচীন উদাহরণ। রেনেসাঁর আলোড়ন-বিলোড়নের মধ্য দিয়ে যে সভ্যতা জাগলো তার উদার প্রাঙ্গণেও নিষেধাজ্ঞার অবসান হয়নি ঃ বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমের বহুদেশে বহু শিল্পী নির্যাতিত হয়েছেন। এবং এঁরা প্রধানত লেখক। কারণ শিল্পকলার অন্যান্য মাধ্যম যেমন স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্র সঙ্গীত নৃত্য প্রকাশে ও বক্তব্যে অনেকটা দূরবর্তী ; কিন্তু ভাষা নিয়ে যার কারবার তিনি সহজেই ধরা পড়ে যেতে পারেন। কিভাবে বিদ্রোহী হবেন একজন স্থপতি ? স্থপতি ইচ্ছে করলেই কিছু নির্মাণ করতে পারেন না

কারণ তাঁর শিল্প স্থাপত্য যার উপকরণ প্রচুর অর্থব্যয়ের মুখাপেক্ষী ; নিজের চেষ্টায় জমি পাথর ইট কাঠ লোহা রং জোগাড় ক'রে প্রাসাদ তৈরীর সাধ্য স্থপতির না থাকাই সম্ভব। কিন্তু তার কতগুলো সুবিধাও আছে : প্রথম তার কাজ এমনি যার কোনো বিকল্প নেই সেজন্য প্রয়োজন দেখা দিলে তার ডাক পড়বেই ; দ্বিতীয়ত, সৌন্দর্য সৃষ্টির সুযোগ থাকলেও স্থাপত্য মূলত প্রয়োজনের শিল্প, অগ্রসরমান সমাজে যার চাহিদা অনিঃশেষ। সুতরাং তার বেকার হওয়ার ভয় কম। কিন্তু এই অবিচ্ছিন্ন নিয়োগ-অবস্থা তার স্বাধীনতার পরিপন্থীও নয়, যদিও একটা যুগের স্থাপত্যের মধ্যে জাতি ধর্ম শ্রেণী বা সমাজরুচির প্রকাশ ঘটতে পারে ; উদাহরণ গ্রীক স্থাপত্য, বারোখ স্থাপত্য। হিন্দু স্থাপত্য, ইসলামিক স্থাপত্য। স্থাপত্য-শিল্পীর বক্তব্যের অস্পষ্টতা ও অনন্তত্বই তার রক্ষাকবচ। এবং ভাস্কর্য চিত্র সঙ্গীত নৃত্যের ক্ষেত্রেও এটা সত্য। ভাস্কর্যের দৈহিক নগ্নতাও যে আপত্তির প্রশ্রয় দেয় না তার প্রমাণ গ্রীক ভাস্কর্য হিন্দু ভাস্কর্য। পিকাসোকে ফ্রাঙ্কোর স্পেন ছাড়তে হয়েছিল। তারও কারণ কিন্তু গার্ণিকা ছবি নয় বরং তার বামাচারী ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিবাদ উদ্ভাসিত ছিল। বিদ্রোহী সঙ্গীত কিংবা নৃত্য রচনার জন্য কোনোকালে কেউ শাস্তি পেয়েছেন কিনা জানিনা। এই পটভূমি স্মরণে রেখে আমার বলতে পারি আধুনিককালে যে শিল্পমাধ্যম অবদমনের আওতায় গিয়ে পড়তে পারে তা সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও নাটক। চলচ্চিত্র ও নাটকের ক্ষেত্রে অবস্থাটা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির কারণ সেনসরের বেড়া না ডিঙিয়ে চলচ্চিত্র আত্মপ্রকাশই করতে পারে না ; এবং লণ্ডন ও পারীতে দেখেছি যেসব হলঘরে নগ্ন যৌনক্রিয়ার দুঃসাহসিক ছবি দেখানো হয় সেগুলো সাধারণ প্রেক্ষাগৃহ নয়। সেগুলো এক ধরনের ক্লাব, যার কার্যকলাপ দেশের নাগরিক অধিকার বিধি দ্বারা সংরক্ষিত। ওখানে যারা যান তাঁরা দর্শক নন, সদস্য। পাশ্চাত্যে সম্মত বয়স্কদের (consented adults) মধ্যে পরস্পর এমন অনেক কিছুই চলতে পারে সাধারণ দৃষ্টিতে যা নিন্দনীয়। সেসব ব্যক্তি স্বাধীনতারই প্রাগ্রসর দৃষ্টান্ত। কিন্তু সাধারণ-ভাবেও বেশির ভাগ যে ধরনের ছবি ওরা তৈরী করেন আমাদের

দেশে তা অকল্পনীয়। কিছুদিন আগে ঢাকার বইয়ে চুম্বন দৃশ্য চিত্রায়ণ নিয়ে কাগজে পত্রে বহু হৈচৈ হয়েছে কিন্তু এটা তো ওদেশের ছবিতে নস্যি। কাজেই সেনসব নীতিমালায় একটা দেশের ধর্মবোধ, সামাজিক রীতিনীতি, সাংস্কৃতিক রুচি প্রতিফলিত হয় এবং চলচ্চিত্র রচয়িতাকে তার মধ্যে কাজ করা ছাড়া উপায় নেই। এদিক থেকে তার স্বাধীনতা কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রিত বৈ কি। নাটক আরেকটি মাধ্যম, জনগণের সঙ্গে যার প্রত্যক্ষ সংযোগ; এবং তা এমন এক শিল্প, যার সাহায্যে এমনকি মানুষকে উত্তেজিত করাও সম্ভব। পরাধীন আমলে নাটকাভিনয়ের উপরে যে নানারকম বিধিনিষেধ ছিলো এটাই তার মূল কারণ। কিন্তু নাটক যৌথশিল্প বলে সে স্বভাবতও নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলে; প্রথম কল্পনা থেকে শুরু করে প্রদর্শন পর্যন্ত বহুজনের আবেগ, চিন্তাধারা ও কলা-কুশলতা তিলে তিলে তাকে নির্মাণ করে। শুরু থেকেই নানা বিবেচনার অনুসারী; তাই অনেক সময়ই আক্রমণের লক্ষ্য বস্তু হয় না, যদিও মাঝে মাঝে সাহিত্যের আকারেও দেখা দেয় বলে সে পরিধির একেবারে বাইরেও নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যেক্ষেত্রের সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নটি প্রধানভাবে জড়িত তা হলো সাহিত্য। সাহিত্য, ভাষা যার বাহন, জাতির প্রাণশক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ ভাণ্ডার: এবং লেখক তার আত্ম-প্রকাশের চরিত্রে সরাসরি সমাজ প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের মুখোমুখি। সর্বস্তরে এই সম্পর্কে পক্ষ-প্রতিপক্ষ হয়তো নয় কিন্তু কোনো কোনো পর্যায়ে তো বটেই; নাৎসী রাজ্যে সাহিত্য-সাধনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিলো না কিন্তু জার্মান রক্ত জার্মান জাতীয়তার উদ্দীপনাহীন রচনার প্রকাশও ছিলো অসম্ভব। অবশ্য আমরা জানি শিল্প একটা সংগ্রাম এবং শিল্পী সাময়িক নয় সার্বক্ষণিক সৈনিক, যার প্রথম যুদ্ধ নিজের সঙ্গে অভিজ্ঞার আয়ত্তের জন্য; অভিজ্ঞতার সুধা ও গরল পান করে যুগপৎ নীলকণ্ঠ হওয়া তার অস্তিত্ব। এবং সে অভিজ্ঞতা প্রকরণ এবং শৈলীগতও বটে। ঐতিহ্যকে হাতের কাছে পেলেও চেষ্টা দিয়ে তাকে আয়ত্ত করতে হয়; তাতে ডুবতে হয়, ঢের ভিতরে সাঁতার কেটে কেটে খুঁজে নিতে হয় অনাবিষ্কৃত বীজগর্ভ জলজ লতাগুল্ম, অদেখা ফোয়ারা। প্রথম আত্ম-

প্রকাশেই যদি কেউ শৈলীগত বিপ্লব আনে তখন বুঝতে হবে অন্তরালে অনেকদিন ধরেই চলেছে তার প্রস্তুতি। এই যে সংগ্রাম, এখানে কারুর সঙ্গে তার বিশেষ বিরোধ নেই ; এবং যেটুকু আছে তা জীবনেরই দ্বন্দ্ব। শৈল্পিক অভিজ্ঞতাকে ধারণ করবার, সাজাবার ও বাড়াবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষে পৃথক পৃথক অভ্যাস ও পদ্ধতি থাকবে, এটাই স্বাভাবিক ; যেমন প্রকৃতিবাদী এমিল জোলা দৈনন্দিন চাক্ষুষ ঘটনাবলীর নোট রাখতেন এবং প্রয়োজন মতো উপন্যাসে ব্যবহার করতেন সে সমস্ত। তেমনি রচনার মুহূর্তটি তার একান্ত নিজস্ব ; টেবিলে পাকা আপেল ও পায়ের উপরে এক টুকরো বরফ না থাকলে শেলী যে লিখতে পারতেন না এটা উদ্ভট হোতে পারে কিন্তু শিল্পী চরিত্র বিরোধী হয়। কাজেই কোথায় কিভাবে বসে বা শুয়ে উপুড় কিংবা কাত হয়ে লেখক লিখছেন তা সকল প্রশ্নের বাইরে ; আসল ব্যাপার সেই রচনার বক্তব্য, দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন, যা ভাষা শৈলী ও প্রতীক রূপকের মধ্যেও উদ্বৃত্ত থাকে, যদিও কোন রচনার সমাজবিরোধী নীতিবিরোধী রাষ্ট্রবিরোধী চরিত্র নিরূপণ করা যথেষ্ট কঠিন। অবশ্য আবেগ ও ভাবনার রাজ্যে নতুন নতুন বিপ্লবের ইশারা থাকে সকল মহৎ রচনায় ; যদিও সকল শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যেই জড়িয়ে থাকে একটা 'অন্ধকার', যার নানারকম ব্যাখ্যা সম্ভব। সেক্সপীয়র তাঁর নাটকে সমসাময়িক সমাজ ও বহু খ্যাতনামা ব্যক্তির সবচেয়ে নির্মম সমালোচনা করেছেন অথবা রচনা থেকে তাঁকে ধরবার জো নেই—আত্মরক্ষার জন্যই তিনি ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন কিনা তাও গবেষণাযোগ্য। 'মেঘদূতে' রয়েছে তৎকালীন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দারুণ কটাক্ষ ও বিদ্রোহ ; কিন্তু সেজন্য অপরাধী বিবেচিত হননি কালিদাস। কিছু রচনা অবশ্য থাকে যার মধ্যে বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট যেমন আনকল টমস কেবিন, লা মিজারেবল, নজরুলের কবিতাবলী। এদের কণ্ঠস্বর সত্য ও ন্যায়ের জন্য, মানবতার প্রতিষ্ঠার জন্য। এধরণের লেখার বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়া সভ্যতার সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। আজকের দিনে সবচেয়ে বড়ো যে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে তা হোলো লোকায়ত্ত রাষ্ট্রে লেখকের ভূমিকা এবং তার স্বাধীনতার সীমা। কেউ কেউ বলবেন, লোকায়ত্ত রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্র ; জনগণের আশা

আকাঙ্ক্ষাই সেখানে প্রতিফলিত, অতএব কি এমন থাকতে পারে, যেখানে লেখক বা শিল্পীর পক্ষে বিরোধী, বিদ্রোহী বা বিপ্লবী হওয়া প্রয়োজন? বরং রাষ্ট্রীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রের নির্দেশে কাজ করে যাওয়াই তো তার কর্তব্য? কিন্তু এটা ছেলেমানুষী যুক্তি। প্রথম কথা হোলো, রাষ্ট্র মানুষেরই কৃত একটি সংগঠন এবং তা পরিবর্তনযোগ্য; দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের আগে যা সত্য তা হোলো মানুষ; এবং তৃতীয়ত, রাষ্ট্র ও ক্ষমতাসীন সরকার এক জিনিশ নয় তাই অনেক সময় সরকারবিরোধী হওয়া রাষ্ট্রবিরোধী হওয়া নয়। সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র ও রাজনীতি অবিভাজ্য, কারণ সে রাষ্ট্র বিপ্লবী রাজনীতিরই অনিবার্য পরিণতি এবং প্রতিবিপ্লবী শ্রেণী ও শক্তির মুখে সেখানে প্রথম প্রথম অবাধ আত্মপ্রকাশের উপর বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে, এটা বিচিত্র নয়; কিন্তু সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে আত্মপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা বাঞ্ছনীয়। একস্তর থেকে অন্যস্তরে, কখনো ক্রমবিকাশের ধারায় আবার কখনো লাফিয়ে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতি সমাজধর্ম; কিন্তু তার সঙ্গে আর একটা জিনিসও আছে, যার নাম মানবধর্ম। সমাজধর্মের সামঞ্জস্য চাই—একটা সুনির্দিষ্ট মতবাদ সেখানে একটা বৃহৎ কাঠামো নির্ধারণ করে মাত্র। চিন্তার স্বাধীনতা ছাড়া সমাজদেহে স্থবিরতা আসতে বাধ্য। তেমনি প্রয়োজন সৃষ্টির স্বাধীনতা। কেবল এই স্বাধীনতাই আনতে পারে রচনায় ক্ষমতা, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য। ক্ষমতা, বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য বিষয়ে ভাবনায় শৈলীতে, যা এক অন্তহীন উর্বরতা। মনে রাখতে হবে শিল্পীও সমাজের একজন, এবং রাষ্ট্রের অন্তর্গত সম্ভবত সবচেয়ে সচেতন নাগরিক। তিনি সেই জনমণ্ডলীর আশা-আকাঙ্ক্ষা বেদনা উদ্বেগ ও ধ্যান-ধারণাকে প্রকাশ করবেন এটা অনিবার্য; কিন্তু তিনি তোতাপাখির মতো কেবল অফিসিয়াল বুলি আওড়াবেন, এই প্রত্যাশাও মূঢ়তা। বরং একদিকে যেমন থাকবে তার সমাজ ও প্রতিষ্ঠানের চিত্রায়ণ, এবং সে সম্পর্কে পরিমাপ ও মন্তব্যের, এমনকি, কখনো কখনো রস আনন্দ ও সৌন্দর্য সৃষ্টির খাতিরে তা'দের অপরূপ কিংবা কিম্ভূতিকরণের অধিকার, সঙ্গে সঙ্গে সকলরকম অন্বেষণের পথও খোলা রাখতে হবে তার জন্য। অন্বেষণ, জীবন সম্পর্কে সমস্তরকম অন্বেষণ। এই অন্বেষণের একটি বৈশিষ্ট্য প্রচলিত ধর্ম মতবাদ আদর্শ নীতি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে নতুন নতুন জিজ্ঞাসা; এবং আরেকটি, মৌলিক মানবভাগ্যের অনুশীলন।

১৯৭৩

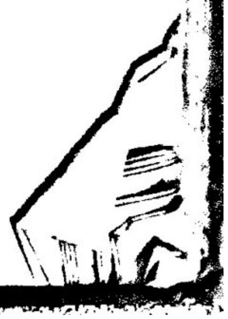

বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব

এক সাক্ষাৎকারে বিবিসির সাংবাদিক বন্ধু যখন প্রশ্ন করে বসলেন আপনি কি মনে করেন স্বাধীন বাংলা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্র কোল্কাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হলো, তখন হঠাৎ কি জবাব দেবো ভেবে পাইনি ; কিন্তু চুপ থাকাও সম্ভব ছিলো না কারণ ক্ষুধার্ত টেপরেকর্ডার আমার কথা গ্রাস করবার জন্য তখনো ঘুরে চলছিল ঃ আমার অস্তিত্বের ভিতর থেকে যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এলো কিছু শব্দ। হ্যাঁ এটা সত্য। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে মানবতার জন্য বিশ্ব সমাজের মুখ যেমন ঘুরেছে বাংলাদেশের দিকে, তেমনি এখন যা কিছু বাংলা, তারও উৎস তাঁরও আকর্ষণক্ষেত্র বাংলাদেশ। রক্ত দিয়ে আমরা বাংলাভাষাকে বাঁচিয়েছি, বাংলার স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছি আমরা আরও রক্ত দিয়ে, অতএব নতুন বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্বের ভার বর্তেছে আমাদেরই, মানে বাংলাদেশের মানুষেরই উপর।

বলা বাহুল্য আমার ব্যক্তিগত বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত ভাবাবেগ প্রসূত নয়, এটাই বাস্তব সত্য।

কথাটা কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। ইংরেজী ভাষাভাষী লোকের সাহিত্যিক রাজধানী লণ্ডন এবং ফরাসী ভাষাভাষীদের পারী ঃ এই অর্থে বাংলার সাহিত্যিক রাজধানী হিশেবে কোলকাতার প্রতিষ্ঠা ভারতে ইংরেজ

শাসনেরই অবদান। গৌড় আরাকান রাজসভা কি কৃষ্ণনগর প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের স্থান হিশেবে স্মরণীয় কিন্তু এদের কেন্দ্রীয় মর্যাদা ছিলো না; কারণ ঐক্যবদ্ধ জাতি ব্যতীত কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য অসম্ভব। ইংরেজ আমলে সমস্ত অঞ্চল নিয়ে ভাষার বৈচিত্র্য নিয়েই মোটামুটি ভাষার ভিত্তিতে সংহত হোল বেঙ্গল, সুতরাং তার নির্যাস হিশেবে কলকাতার আবির্ভাব খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এও সত্য যে, কোলকাতা ছিলো জন্মান্ধ, সাম্রাজ্যবাদী কাঠামোর ভিতরে বণিক পুঁজির পঙ্গু শিশু; অতএব ইউরোপীয় রেনেসাঁ আদর্শের বজ্রমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বাংলার মর্মস্থল হতে পারলো না। কলকাতার আপাতসমৃদ্ধি পূর্ববঙ্গের শোষণের ফল এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের চিরদুঃখী নির্যাতিত কৃষক সমাজ পঁচিশ বছর আগে বিচ্ছিন্নতাকে মেনে নিয়েছিলো, যদিও বঙ্গবিভাগের জন্য তারা দায়ী নয়। কিন্তু তখনো যে সে নতুন ঔপনিবেশিকতা ও শোষণের শিকার হয়েছে, তা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেনি। তখনকার বিচ্ছিন্নতা তার ভুল ছিলো না, ছিলো আত্মরক্ষার আশ্রয়। একে সাম্প্রদায়িকতা ব'লে অভিহিত করা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। পশ্চিমের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার মতো কৃত্রিমতাকে যে অবস্থাচক্রে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম বহু রক্ত দিয়ে তার মূল্য আমাদের পরিশোধ করতে হয়েছে। সে সময়ে অখণ্ড বাংলা সম্ভবত স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ার যোগ্য ছিল না, তার প্রধান কারণ হিন্দু-মুসলিম বিভেদ, যেভাবেই তা জন্ম ও প্রসার হয়ে থাক না। এই বিভেদের সমসাময়িক কারণ হয়তোবা বিদেশী শাসক চক্রান্ত, কিন্তু তার গভীরে রক্তগত ও সাংস্কৃতিক বিরোধও কার্যকরী ছিলো, যার নাম আর্য-অনার্য বিরোধ, সুবিধাভোগী বৈপরীত্য। আর্য-প্রভাবিত গৌড় বা পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাসের ধারায় সর্বদাই উত্তর-ভারতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এসেছে, যেখানে সমতট বা পূর্ববঙ্গ সপ্তম শতাব্দীতেও তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। এবং এখন, বাংলাদেশ প্রকৃত স্বাধীন ঃ পৃথিবীর নবীনতম এবং লোক সংখ্যার অনুপাতে অষ্টম বৃহৎ রাষ্ট্র। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মমূলে ছিলো বাংলা ভাষা, সুতরাং এরপর যা কিছু বাংলা তারও কেন্দ্রভূমি বাংলাদেশ, এর অর্থ যদিও নয় পশ্চিম বঙ্গের সঙ্গে সামগ্রিক বিচ্ছিন্নতা।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যেমন তেমনি বাংলা সাহিত্যেরও রাজধানী এখন ঢাকা, কিন্তু এ প্রাথমিক সত্য মাত্র। কাজের মধ্য দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করাই এখন আমাদের কর্তব্য। বাংলা আমাদের রাষ্ট্রভাষা; বাংলা আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভাষা, এবং বাংলা এখন উচ্চশিক্ষাসহ সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম। সর্বস্তর ও সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষার এই ব্যবহার একে ক্রমে শক্তিশালী করবে, করবে কর্মক্ষম এবং সৃষ্টিগর্ভ। আবহমান বাংলা সাহিত্য পশ্চিমবঙ্গের মতো আমাদেরও যে ঐতিহ্য, এই উপলব্ধি থেকে পাকিস্তান আমলেও আমরা বিচ্যুত হইনি তার প্রমাণ আমাদের গত পঁচিশ বছরের সাহিত্যের ইতিহাস। কেউ-কেউ হয়তো এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি। স্বাধীন বাংলার জন্ম হওয়ার পর ঐতিহ্যের এই অবিভাজ্যতা আরো গভীরভাবে স্বীকৃত হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ঐতিহ্যকে আমরা এখন গ্রহণ করবো বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে তা ছাড়া হবে না সে যথার্থ গ্রহণ। কারণ ঐতিহ্যের যে ধারাটি বর্তমানের কাজকে সঞ্জীবিত করে প্রথমে তাকে আবিষ্কার করাই শ্রেয়, নইলে গতানুগতিক তথ্যানুসন্ধানেই পর্যবসিত হবে ইতিহাসচর্চা। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সমসাময়িক সাহিত্য-ধারার সঙ্গে শুধু যোগাযোগ নয়, তার মধ্যে অবগাহনকেও জাগিয়ে রাখতে হবে। এতকাল ওখানকার সমকালীন সাহিত্যকে আমরা বিদেশী দৃষ্টান্ত হিশেবেই গণ্য করেছি, কিন্তু এখন যদিও তা ভারতীয় এবং অনেকটা ভারতীয় আবহের মধ্যে ডুবছে ভাসছে, আমরা তাকে বাংলাসাহিত্য নদীর অন্যতম প্রবাহ হিশেবেই গণ্য করবো। ওখানকার রচনাও আমাদের রচনা, এদিক থেকে যে, একটি ভাষার মধ্যে যে সৃষ্টি সেগুলোর মধ্যে পরস্পর আকাশ-পাতাল বৈসাদৃশ্য থাকতে পারে না।

কলকাতার সাহিত্য-পরিবেশ অনেক বেশী জাগ্রত ও নমনীয়, বিশেষ করে তা প্রায় দু'শ বৎসরের অভিজ্ঞ। ওখানকার পত্রপত্রিকা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাঠকসমাজ সাহিত্যের অনুকুল আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছে; কিন্তু আমরা যে অধিকতর সজীব বলিষ্ঠ ও সরস তাওতো স্বীকার্য? আমরা ওদের ভাষা ও শৈলীকে সহজেই আয়ত্ত করে নিতে পারি; কিন্তু ওরা

আমাদের মত জীবনটা পাবে কোথায়? পাবে কোথায় এমন সংগ্রাম? এমন মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা? কলকাতার সাহিত্য বন্ধ্যাত্বের চোরাবালিতে আটকে ধুকে ধুকে মরছে। কবিতায় তবু কিছুটা সততা আছে; কিন্তু উপন্যাস তো রীতিমত ব্যবসার জিনিশ। যেখানে একজন জনপ্রিয় লেখক লাইন প্রতি কত টাকা পান তাই নিয়ে গর্ব করতে পারেন, সেখানে সাহিত্যের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। লেখার মধ্যে যৌনতা, অশ্লীলতা কিংবা খুনখারাবী রহস্যের যোগান দেওয়া ছাড়া যে তাঁদের বিকল্প নেই, এখানেই তার উত্তর। অবশ্য ভালো লেখা সেখানে একেবারেই নেই কিংবা গুরুতর লেখক অনুপস্থিত, তা আমি বলছি না; কিন্তু সাধারণ প্রবণতাটি ওইরকম। বলা বাহুল্য, এর অন্তর্মূলে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী সমাজের পুচ্ছগ্রাহিতা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

আমরা বাংলাদেশের তরুণ সাহিত্য শিল্পীরা বাংলা সাহিত্যের নেতৃত্ব নিয়ে নিয়েছি এটা প্রায় প্রাকৃতিক সত্য, কিন্তু মানবিক কর্তব্যটুকু এখনো বাকী, যার নাম সৃজনশীলতা।

১৯৭৩

লেখকের নতুন বংশ

ঝড়ের মধ্যে যখন আলোড়িত, ছিন্নভিন্ন তখন পাখিরা পালায়, পাখিরা মরে, পাখিরা পায় নানা জখম ; কিন্তু ঝড়ের শেষে গাছের ডালে ডালে পাতায় ঝোপড়ায় খড়কুটোর বাসার ভিতরে নতুন পাখির মেলা বসতেও দেরী লাগে না, তার মোটা কারণ নিশ্চয়ই জীবন অপরাজিত। ঝড়টা সাময়িক কিন্তু চিরন্তন বনভূমি এবং নানা ঋতু, তার সঙ্গে পথের অস্তিত্বও, গানও। একাত্তরে বাংলায় যে ঝড় বয়ে গেল তার প্রবল চাপে পালিয়েছে সব পুরনো পাখিরা, নকল পাখিরা সাহিত্যের বনভূমি থেকে আত্মগোপন করেছে যারা তোতার মতো আওড়াতো মনিবের শেখানো বুলি, এবং উড়ে বেড়াতো ডানায় রং মেখে কৃত্রিম চাঁদোয়ার নীচে। এখন ঝড়ের শেষে সবুজ গাছের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যখন বলি বেরিয়ে এসো নবীন পাখিরা, ভস্মস্তূপ থেকে বেরিয়ে এসো, এসো দূর পাহাড় থেকে,সাগর থেকে—তখন কিছু কম বলি না, বলি না বেশিও। ঋতু এবং পাখি অবিভাজ্য।

উপরিউক্ত উপমাটা আকস্মিক নয় ; মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে লেখকের যে নতুন বংশ জন্ম নিয়েছে তাদের মেধাবী কণ্ঠস্বর আমি শুনতে চাই। তাদেরকে দেখতে চাই, বুঝতে চাই। এবং কেবলমাত্র ইতিহাসের পটেই তাঁরা গাঢ়বর্ণে চিত্রিত হতে পারেন। বিভাগোত্তরকালের মূলত সাহিত্যের নতুন বংশ ছিলো বামপন্থী বিপ্লবী, নন্দনতত্ত্বের চাইতে রাজ-

নীতিই যাদের কাছে প্রাধান্য পেয়েছে। এবং তখনকার সমালোচনাও ছিল একরোখা উগ্রপন্থী। যেমন গল্প সংগ্রহ জেগে আছি প্রকাশিত হলে (১৯৫০) তার সম্পর্কে মুক্তি পত্রিকায় একজন অধ্যাপক লিখেছিলেন এখান থেকেই আমাদের যাত্রা হলো শুরু। এখানে সাহিত্য-বিবেচনার পরিবর্তে দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই ছিলো সংকেত। শ্রেণী সংগ্রামের অগ্রবর্তী যোদ্ধা হিশেবে দায়িত্ব পালন না করলে লেখক নিন্দনীয়, এবং প্রগতিশীল নয় এমনি একটা শাসনের মধ্যে তৎকালীন নবীন বংশের অস্তিত্ব বিদীর্ণ হয়েছিলো। সেজন্য এ সময়কার সাহিত্যের ফসল অপ্রচুর। কিন্তু তাই বলে এদের ভূমিকা মোটেই নগণ্য নয়—বরং ছিলো, অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। তার কয়েকটি দিককে আমরা চিহ্নিত করতে পারি----যেমন প্রথম, এরা মধ্যপ্রাচ্যপন্থী সাহিত্য ধারাকে অবাস্তব প্রতিপন্ন করেন, যদি তার মধ্যে কখনো কখনো রোমান্টিসিজমের শিল্পসত্য ধরা পড়েছে, দ্বিতীয়ত জনগণই শিল্প সাহিত্যের যাত্রা ও গন্তব্য এও তাঁদের উদ্যোগ, তৃতীয়ত গণবুলির আবিষ্কার ও ব্যবহারের মধ্যে এরা নতুন করে সাহিত্যের মুক্তি খুঁজেছেন।

বাংলাদেশ সাহিত্যে লেখকের দ্বিতীয় বংশের জন্ম যাটের দশকে, যখন সামরিক শাসনরূপে ঔপনিবেশিক শক্তি সুদৃঢ়ভাবে চেপে বসেছে, এবং পঞ্চাশের আগুন নির্বাপিত, যদিও যাঁতাকলের নীচে পড়ে সারা জনপদে ধিকিধিকি জ্বলছিলো। এই বংশ নাগরিক এবং মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ সম্ভূত। মার্কিনী বীট জেনারেশনের দার্শনিক ও শিল্পকলাগত প্রভাব এখন ওদের মধ্যে এসে পড়লো তার কারণ বোধ হয় এই ছিলো যে, এরা সামাজিক ভিত্তিহীনতা ও শুন্যতার সন্তান, তাই ওদের মুখ জীবনের নয় মৃত্যুর দিকে, বিশ্বাস নয় অনাস্থার দিকে, আলো নয় অন্ধকারের দিকে। বিষয়ের চেয়ে রীতিই পেল প্রাধান্য, ভাবের চেয়ে ভাষা। পূর্ববর্তী বাস্তবতাবাদী ধারাকে ওরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করলেন, এবং নিজেরা হলেন কখনো রোমান্টিক কখনো প্রতীকী এবং কখনো বা পরাবাস্তববাদী: সৌন্দর্যতত্ত্বের নেশা, কখনোবা, এমনভাবে তাদের পেয়ে বসলো যার কাছে অন্য সব কিছু নিরর্থক। একই সময়ে বেশ কয়েকজন শক্তিশালী তরুণ লেখকের দেখা

আমরা পেলাম, কিন্তু এদেরও সিদ্ধি সামান্য। এই ব্যর্থতা একটি সত্য নতুন করে আমাদের জানিয়ে দিলো, আত্মরতি যতই সূক্ষ্ম কিংবা গভীর হোক তার প্রাবল্য শিল্পের অনুকূল নয়; এবং শ্রেষ্ঠ রচনা সর্বদাই চরমকে এড়িয়ে চলে এবং সামঞ্জস্যপরায়ণ। এতদ্‌সত্ত্বেও এদের অবদান অসামান্য, তার কারণ এদের মধ্যেই আমরা পেলাম নতুন ঋতুর বর্ণালী, পরিবর্তনের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।

বীরের বিপুল রক্তস্রোত আর মাতার অশ্রুধারা পেরিয়ে যারা এলো তাদের অনেকেই হয়তোবা দ্বিতীয় বংশেরই অন্তর্গত, এমন কি তাদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম বংশেরও শিল্পী; কিন্তু এরা নতুন ভোরের পাখি। নতুন গান গাইতে হবে তাদের, উড়তে হবে নতুন নতুন আকাশে এবং নতুন জনপদ নতুন দ্বীপ নতুন সাগর তাদের স্বপ্ন। এখনই তাদের কার্যধারার বর্ণনা আমরা দিতে পারবো না কিন্তু তার মূল রেখাটি অনুমেয়। যদিও প্রাচীনকালে স্বাতন্ত্র্য ছিলো এবং মাঝে মাঝে সত্তাও, ইতিহাসের এই প্রথম আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি; সুতরাং এই নতুন বংশের দায়িত্ব শিল্পীর স্বাভাবিক পরিধির চাইতেও কিছু বেশি। স্বাভাবিকভাবেই শিল্পীর সাধনা অত্যন্ত কঠিন, যার মধ্যে পূর্ণ ও কঠোর আত্মনিয়োগ ছাড়া ঈপ্সিত ফল লাভ অসম্ভব, উপরন্তু এখন বাড়তি কর্তব্য। অতএব আরো আত্মত্যাগ।

যুগপৎ দু'টি কাজে নিয়োজিত হওয়া লেখকের নতুন বংশের বিধিলিপি, প্রায় হাজার বছরের বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতির আত্মসাৎ, যার মূলে সৃজনশীল পুনর্মূল্যায়ন; এবং দ্বিতীয়ত, সৃষ্টি। গুরুতর পুনর্মূল্যায়ন এই জন্য প্রয়োজন যে, ওর মধ্যেই জাতির আবহমান চৈতন্য ভাণ্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ মিলবে, যার মধ্যে নিমজ্জন উর্বরতার একটি শর্ত। এই ভাণ্ডার আরো কিছু উপহার দিতে পারে যাদের নাম রূপক, প্রতীক কিংবদন্তী উপাখ্যান, শিল্পকলার সমৃদ্ধির বিশেষ বিশেষ মাত্রা। উপরন্তু পুনর্মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ মূল্যবোধের রেখা কেটে বার করা সম্ভব হতে পারে, যা কাজ করবে ভবিষ্যতের চলার পথে অন্যতম প্রেরণার মতো। যেমন আমার মনে হয়েছে, আবহমান বাংলা কবিতা আসলে অশ্রু ও অগ্নির

দ্বৈত প্রবাহ। অশ্রুর মধ্যে রয়েছে যেমন আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি ও কামনা তেমনি পরাধীনতাজনিত জাগতিক বৈফল্যের বেদনা অভিজ্ঞান, এবং অগ্নির মধ্যে প্রতিবাদ প্রতিরোধ বিদ্রোহ। প্রতিষ্ঠানের সম্মুখে অসহায় কবির মধ্যে এ দু'য়ের সংমিশ্রণও লক্ষণীয়। আধুনিককালে অশ্রুর প্রধান নির্মাতা রবীন্দ্রনাথ এবং অগ্নির, নজরুল।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন বংশের প্রধান কাজ হবে নতুন গণবুলির রাজ্য আবিষ্কার। এবার রীতির জন্য নয়, কৃত্রিম বিশিষ্টতার জন্যও নয়, বরং সাহিত্যকে বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য। তাঁকে চালিয়ে দেয়ার জন্য ঝর্ণাধারার মধ্যে। এই আয়োজন স্বাভাবিকভাবেই দাবি করবে আজকের নাগরিক লেখকের কক্ষচ্যুতি, পল্লীর, বস্তির, জনপদের পাতালের দিকে যাত্রা করার প্রবেশ করার সংকল্প। জাতিকে তার সমস্ত রকম আলো অন্ধকার সহ ধারণ করতে হবে অস্থিমজ্জায়, গণ্ডুষ গণ্ডুষ পান করতে হবে তার রক্তধারা —তবেই না আমরা নতুন কিছু দেবার উপযুক্ত হবো। নতুন বংশের আরেকটি দায়িত্ব আন্তর্জাতিক প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, সংযোগ সাধন। এটা আগে ছিল, এখনো আছে, কিন্তু আছে বিচ্ছিন্নভাবে। এখন আমরা একটি স্বাধীন জাতির আত্মার কারিগর, বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে নিজেদের নতুন করে মেশাবার সুযোগ পেয়েছি। লক্ষ্য আমাদের শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ সমাজ, লক্ষ্য আমাদের জ্যোতির্ময় মানব-সভ্যতা এবং সব নদীর তো একই গতি, একই গন্তব্য, মহাসাগর সঙ্গম!

১৯৭৩

প্রতীকতা ও কাব্যনাট্য

প্রতীকবাদী অন্দোলনের সারমর্ম আদর্শ সৌন্দর্যের জন্য আকুলিবিকুলি। এবং তাকে শিল্পকলার মাধ্যমেই পাওয়া যায়, এই বিশ্বাস। উনিশ শতকী ফরাসী প্রতীকী কাব্য এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। তার তিনটা বৈশিষ্ট্য সহজেই চেখে পড়ে—প্রথম, এই কবিতা মূলত মরমী ঃ জোলার মতো বাস্তববাদী লেখকরা যেখানে সমসাময়িক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি এঁকেছেন সেখানে প্রতীকীরা ইন্দ্রিয়ের বাইরের কোন শ্রেয়তর বিশ্বের জন্য অস্থির; দ্বিতীয়ত প্রতীকীদের প্রতিবাদ বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে, এবং তাদের আদর্শ জগৎ তাদের বিবেচনায় বাস্তব জগতের চাইতেও সত্য ঃ যেমন আদর্শ সুন্দরের প্রতি বোদলেয়রের এমন আস্থা ছিলো তিনি নিজের জীবন দিয়ে তাকে পেতে চেয়েছেন, ভেরলেনের প্রয়াস ছিলো আত্মা ও শরীরের সমান্তরাল রচনা এবং মালার্মে তাকে খুঁজেছেন তাঁর দৈববাণীসুলভ ও প্রহেলিকাময় কবিতার উচ্চারণে; এবং তৃতীয়ত প্রতীকবাদ যেন সৌন্দর্যতত্ত্বেরই মরমীরূপ।

এতএব প্রতীকী কবিতা যে ভাবে হবে ব্যক্তিময় এবং রূপে সাঙ্গীতিক, তা বলাই বাহুল্য।

এই ব্যক্তিময়তার চরম উদাহরণ আর্তুর রঁ্যাবোর জীবন ও কাব্য সাধনা, যদিও প্রতীকীদের গোষ্ঠীভুক্ত তিনি ছিলেন না। তিনি কবিতার মাধ্যমে ছুঁতে চেয়েছিলেন পরমকে, কিন্তু মানবীয় ভাষায় তা'ও কি সম্ভব?

ঐকান্তিক আত্মমগ্নতা কাব্যবিরোধী কিনা জানিনা, কিন্তু নিঃসন্দেহে তা নাটক বিরোধী, সুতরাং যখন বাস্তববাদিতা থেকে প্রতীকের দিকে সাহিত্যের মোড় ফেরে তখন পরিবর্তনের ধর্মকে মেনে নিলে নাটক কিভাবে আত্মরক্ষা করে এবং থাকে চলিষ্ণু, তা এক মৌলিক প্রশ্ন। সংক্ষেপে আমার মনে হয়, কাব্যনাট্যই তার উত্তর।

যদিও স্বধর্মবিরোধী, এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, নাট্য আঙ্গিকের প্রতি প্রতীকীদের তীব্র আকর্ষণ ছিলোঃ যেমন মালার্মে 'ইজিতুর'কে নাটক হিশেবেই কল্পনা করেছিলেন, এবং তাঁর 'হেরোদিয়াদ'ও নাট্যরীতিতেই রচিত। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মেটারলিংকের নাট্য রচনাবলী, যেসবের মধ্যে চরিত্রের নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই বরং তারা কবির স্বপ্নের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো নাটক স্মরণীয়। ইয়েটসের নাটকগুলোও এই ধারারই স্বাক্ষর বহন করছে।

প্রতীকী কাব্যরীতির সঙ্গে নাটকের বৈপরীত্যকে কাটিয়ে ওঠার একটি প্রধান উপায়, কিংবদন্তী কিংবা রূপকথার আশ্রয় গ্রহণ; কখনো কখনো সংঘাতময় ইতিহাসও উপযুক্ত বিষয়। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও একটি মৌলিক সমস্যা, এইরূপ কাহিনীকে সমকালীন চৈতন্যের তারের সঙ্গে মেলানো, যার অভাবে রচনাটি কিম্ভূত ও নিরর্থক হতে বাধ্য। প্রাচীন কাঠামোর মধ্যে সমকালের উজ্জীবন সহজ কথা নয়, কিন্তু প্রতিভার কাছে অসম্ভব বলে কোনো জিনিশ নেই; প্রতিভার স্পর্শে লোহাও সোনা হয় এই প্রবাদ সত্য। কিন্তু আমরা চাই এমন কোনে নিপুণতার সন্ধান যাকে ব্যবহার করে সাধারণ ক্ষমতার লেখকও পাঠযোগ্য রচনা লিখতে পারে। নাটকের সংঘাতের মধ্যে কবিতার আবিষ্কার কাব্যনাট্যের মূল বৈশিষ্ট্য, সে হিশেবে সেই চাবিকাঠি হোলো, কাহিনীকে ঘটনার অতিরিক্ত বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে একটি তির্যক আবেগের উপরে সংস্থাপন। কারণ, সেই শীর্ষ বিন্দুতেই স্বগতোক্তি ও সাংকেতিকতার অধিক সুযোগ।

কিন্তু এখানেও আরেকটি দিক সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার, তা হোলো, অনর্গল কবিতা যেন চরিত্রের কার্যাবলীকে বিপন্ন না করে। ইয়েটসের 'ছায়াময় জল' (১৯০০) এই দোষে আড়ষ্ট ছিল প্রথম খসড়ায়ঃ ওখানে সংলাপ যেন রক্তমাংসের নরনারীর নয়, বরং কবির স্বয়ং এবং সব

কিছু ঘটছে স্বাপ্নিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে। কবির আদর্শ প্রেমের নাট্যক গীতি-কবিতারূপ এই ভাষাশিল্প রচিত হয়েছিলো মালার্মের আদর্শে, খাঁটি প্রতীকী রীতিতে ; কিন্তু তার পরবর্তী কাব্যনাট্য এ রকম নয়। সেগুলোতে নাটকের উপাদানই বেশী, এবং যেন অভিনয়ের জন্যই লিখেছিলেন।

আমি বলছি, কাব্যনাট্য যদি শুধু পড়বার জন্যই লেখা হয়, এবং তাতে যদি শুধু কবিতাই থাকে, তাহলে সেই কবিতাকে নাটকের আকারে সাজানোর কোনো মানে থাকেনা। কাব্যনাট্য লেখা হবে অভিনয়ের জন্য, তবে নিশ্চয়ই এক বিশেষ ধরণের অভিনয়। কাব্যনাট্য থেকে যদি আমরা বাস্তববাদী সামাজিক নাটকের রস পেতে চাই তাহলে সেটা ভুল। আধুনিককালের এ্যাবসার্ড ড্রামা যেমন এ্যাবসার্ড ড্রামাই, তেমনি কাব্যনাট্যও কাব্যনাট্যই, তার মানে এক বিশেষ ধরণের নাটক। কাব্যনাট্যের অভিনয় দেখতে যাওয়ার সময় সে রকম একটা মানসিক প্রস্তুতি দর্শকদের থাকা চাই। যেমন শেক্সপীয়র দেখতে গিয়ে আমরা শেক্সপীয়ারকেই দেখতে চাই, ইবসেন শ কিংবা আয়োনেস্কোকে নয়।

এর আরেক অর্থ, কাব্যনাট্যে নাটক থাকতে হবে, যদিও একটা বিশেষরূপে, বিশেষ ভঙ্গিমায়। ঋজু হলেও থাকবে তাতে একটি উপাখ্যান বা বৃত্ত, কিছু ঘটনা, কয়েকটি চরিত্র। তাদের কার্যাবলী, সংলাপ। কাব্যনাট্যের উপাখ্যান মানবীয় আবেগ কিংবা কল্পনার একটি বিশেষ অবস্থা। ঘটনা মূলত মানসিক সংঘাত, চরিত্র বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত। প্রতিক্রিয়া, কার্য, হৃদয়ানুবৃত্তি ; এবং সংলাপ, হৃদয় প্রবাহ। সাধারণ নাটকের উপসংহার ক্লাইমেক্সের পর, কিন্তু ক্লাইমেক্স থেকেই কাব্যনাট্যের শুরু। এই গুণাবলী মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারবো, পদ্যে লেখা হলেই নাটক কাব্যনাট্য হয় না, আবার গদ্যে রচিত হলেও কোনো বিশেষ নাটকের কাব্যনাট্য হওয়ার যোগ্যতা কমে না। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' পদ্যে লেখা এবং 'রক্তকরবী' গদ্যে অথচ 'বিসর্জনের' ঝোঁক সাধারণ নাটকের দিকে, কিন্তু 'রক্তকরবীর' কাব্যনাট্যের।

আসল কথা, কাব্যনাট্য কবিতা ও নাটকের দুর্লভ সামঞ্জস্য ; এরা এখানে পরস্পর-বিজড়িত এবং অবিচ্ছেদ্য। অংক কষে বলা যাবে না

কাব্যনাট্যে কতটুকু কবিতার ভাগ, আর কতটুকুইবা নাটকের ; কিন্তু রসিকজন দেখলেই চিনতে পারবেন, এবং তক্ষুনি বলবেন হ্যাঁ এইতো পেয়েছি। আমাদের নতুন কবিতার ধারা প্রতীকের খাতে এসে পড়েছে, এটা বাংলা সাহিত্যের আরেকটি বৃহৎ পালাবদলের লক্ষণ সন্দেহ নেই ; কিন্তু এখন, আমাদের ভুললে চলবে না প্রতীকবাদ বিশ্ব-সাহিত্যে নতুন নয় এবং যত নবীনরূপেই সে ফিরে আসুক না, তার গন্তব্যের সীমানা আছে— যেমন থাকে সব সাহিত্য কিংবা শিল্প আন্দোলনেরই। এই নিয়তিকে বিলম্বিত করার একটি কৌশল ভাবপ্রকাশে নুতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন আধারের আশ্রয় গ্রহণ। কবিতার পরেই আমার মতে কাব্যনাট্য সাহিত্যের সেই প্রসারতা-সাধনের জন্য অপেক্ষমান।

রবীন্দ্রনাথের পরে কাব্যনাট্যকে গ্রহণ করবার সুযোগ এই প্রথম আমরা পেলাম, তাও বলে রাখছি ; কারণ ও সময়ের মন্ময়তার সঙ্গে আমাদের চলতি সময়ের ভাসমানতার আশ্চর্য মিল। বর্তমানে বাংলা কবিতার ভাষাও একদিকে অধিকতর ব্যবহারোপযোগী, অন্যদিকে গভীর হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনকার মাটির ভাষা, এমনকি স্ল্যাং এখন একজন কবি যত সহজে কাজে লাগান, সেযুগে ছিলো রীতিমতো অকল্পনীয়। সুতরাং কাব্যনাট্যের সংলাপ রচনার সুযোগের ক্ষেত্রে আমরা আরো অগ্রবর্তী।

আমি লিখেছিলাম 'ইহুদির মেয়ে' এবং 'জুলায়খা' ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে কারাবাসের সময় (১৯৬১)। এগুলো রবীন্দ্রধারায় গতানুগতিক রচনা। এখন নতুন একটি লিখছি।

আমার এই নিবন্ধ যদি বাংলাভাষায় একটিও নতুন কাব্যনাট্যের জন্ম দেয় তা'হলেই আমি খুশি।

১৯৭৩

সাহিত্যের স্থিরবিন্দু ও ছোটগল্প

পাতা ঝরে ফুল ফোটে, প্রকৃতির এই প্রতিমুহূর্তের রূপান্তরের ভিতরে স্থিরবিন্দুর মতো সাহিত্যেরও তেমন কিছু আছে কি যাকে আমরা, সাধারণভাবে, বলতে পারি সবকালের স্থায়ী উপাদান? সাহিত্য ভাষার সাংকেতিকরণ, এবং সেই ভাষা অর্থবান, কখনোবা নিরর্থ, মানবীয় ধ্বনিমালা। লিখিত ভাষার একটি অদৃশ্য প্রভাব সাহিত্যের উপরে বরাবরই থাকে, কিন্তু চলতি কালে সাহিত্যের উর্বর উৎস প্রবহমান জনবুলি, যার মধ্যে সময়ের সকল আবেগ আক্ষেপ আগুন ও যন্ত্রণা। লেখক নামক ব্যক্তি সময়ের এই অবিরাম ধারার মধ্যে নিমজ্জিত আছেন বলেই তার রচনার রূপ বর্ণ গন্ধ এরই ক্ষরিত নির্যাস, যদিও যুগে যুগে লিপিবদ্ধ শৈলীসমূহের কোনো একটার কিংবা কয়েকটার বিমিশ্রণ এর মধ্যে লুকোনো থাকতে পারে। অতএব সাহিত্যের ভাষাগত কিংবা শৈলীগত পরিবর্তন একান্ত স্বাভাবিক; এবং সময়ের ছন্দকে এইভাবে ধরে রাখার ক্ষমতা নিশ্চয়ই জাতিগত সজীবতার লক্ষণ। কিন্তু পরিবর্তন মাত্রই অভিনবত্ব নয় এ কথাও সত্য। পরিবর্তনের সাধারণ ধর্ম রূপান্তর, একটি আদি স্থিরবিন্দুকে কেন্দ্র করে, আচ্ছন্ন করে কিংবা জড়িয়ে জড়িয়ে।

সাহিত্যের সেই স্থিরবিন্দু বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে নানাভাবে আছে, কিন্তু ছোটগল্পে তা গল্প, যা আজকে আক্রমণের মুখোমুখি।

আধুনিক মননশীলতার জটিল আবর্ত উপন্যাসের স্থিরকেন্দ্রকেও বিপর্যস্ত

করেছে মনস্তাত্ত্বিক বিস্ফোরণ ও অতিতরলীকরণের মধ্য দিয়ে যার অবলম্বন মূলত চৈতন্যপ্রবাহের অন্তঃস্রোত। এর ভিত্তি অবশ্যই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েডের নতুন ভাবনা এবং পরবর্তীকালে পরাবাস্তববাদী (Surrealist) পরীক্ষা। লিখনরীতিতে তা এক ধরণের চরমতার আমদানি করেছিলো যার অন্যতম প্রমাণ জয়েসের ইউলিসিস। কিন্তু এই রীতি যে একটা ব্যতিক্রম তাও প্রতিষ্ঠিত হোলো এইভাবে যে পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই জয়েসের সার্থক অনুবর্তন আমরা পাইনি।

পুরনোর বর্জন এবং বৈচিত্র্য সন্ধান শিল্পকলার চিরন্তন ধর্ম, কিন্তু জীবন যেমন তেমনি শিল্পকলাও কোনো চরমকেই বেশিক্ষণ ধারণ করতে পরে না। চৈতন্যপ্রবাহমূলক কিংবা পরবাস্তববাদী কোনো সার্থক উপন্যাস এপর্যন্ত বাংলায় লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই, যদিও মানিকের অবচেতন-বিবরণ উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ছোটগল্পে ষাট ও সত্তর দশকের হাওয়াটিও খুব অনুকূল প্রবহমানতা পেয়েছে তা আমরা বলতে পারিনা। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কিংবা কাব্যিকতা, গল্পের স্বাভাবিক রূপের প্রক্রিয়া হিশেবে শুরু, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ থেকে এমনিতেই জড়িয়ে আছে বাংলা ছোটগল্পে, এবং এ একটা মৌলিক প্রয়োজন; কিন্তু গোটা লিখনরীতিকে একটা কঠিন প্রবন্ধ, গল্প-কবিতা কিংবা বিমূর্ত স্বগতোক্তিতে পরিণত করা অন্য জিনিশ। ছোটগল্পের স্থিরকেন্দ্র এখানে বিচলিত, কখনো কখনো দুর্নিরীক্ষ : কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো শব্দের অতিরিক্ত স্তম্ভায়ণ।

বুঝতে পারি হয়তো এও একটা বিদ্রোহ, সাহিত্যে নতুন কিছু করতে হবে সে প্রতিজ্ঞারই রূপায়ণের চেষ্টা। আর আসলেও জীবনকে যে মুহূর্তে নিরর্থ বলে মানি, তখন রীতিতেও নিরর্থতার চর্চা করতে বাধা কোথায়। এ একটা বক্তব্য হোতে পারে। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিমত হোলো, শিল্পরীতিতে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার আমি পক্ষপাতী; এবং যাঁরা তা করেন তাঁরা গতানুগতিক নন, তাঁদের আমি স্বাগত জানাই। কিন্তু আমি এও বিশ্বাস করি, যতক্ষণ মানব-সমাজ আছে ততক্ষণ সব শিল্পই মানুষের রস কিংবা সৌন্দর্য পিপাসার নিবৃত্তি-সাধনে অল্প-বিস্তর নিয়োজিত;

এবং সে হিশেবে, শৈলীর মূলধারাটিকে অতিদূরে টেনে নিয়ে গেলে চলবে না। নতুনত্ব মানে উদ্ভট নয়, বৈচিত্র্য মানে নয় ব্যভিচার; এবং বিদগ্ধ হওয়ার জন্য দুর্বোধ্যতা অপরিহার্য, এ ধারণাও ভুল।

আমাদের ছোটগল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, এটা আমাদের সচলতা এবং প্রাণধর্মেরই পরিচয়; কিন্তু ছোটগল্পে পরিণত সৃষ্টিও আমরা চাই। পরিণতি শুধু মাত্র একটা আক্ষেপের উপরে ভর করে আসতে পারেনা ঃ তার জন্য চাই একদিকে আবেগ ও মননের সামঞ্জস্য এবং অন্যদিকে ভাষা ও শৈলীগত নিপুণতা, যা নদীর মধ্যবর্তী ঋজু ধারাটির মতো বয়ে চলে। ছোটগল্পে গল্প ফিরে আসুক, আসুক নতুন বর্ণে নতুন রূপে, এই আমরা চাই। বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ নাইবা পেলাম, না-হোক সে ঝিনুকের ভিতরের নিটোল মুক্তোর মতো; কিন্তু আকাটা হীরক তো হতে পারে? আকাটা হোলেও হীরক হীরকই, অন্য কিছু নয়। একটি নতুন ঋতুর ফুল-পাতা কাঁটায় ছাওয়া জ্যোৎস্না অন্ধকার রৌদ্রের বাগান হয়ে দেখা দিক্‌না আমাদের নতুন গল্পগুচ্ছ?

১৯৭০

মুক্তিযুদ্ধ ও সাহিত্য

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে আছে যে গভীর মানবিক ট্র্যাজেডি তা বাংলাদেশে মহৎ শিল্পসাহিত্যের জন্ম দেবে, এ প্রত্যাশা শুধু মনস্তাত্ত্বিক নয় নন্দনতত্ত্বের দিক থেকেও অত্যন্ত বাস্তব। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের বিগত সোয়া এক বছর বলতে গেলে, প্রায় প্রকাশশূন্যতার মধ্যেই আমরা কাটালাম। সাহিত্যের কথাই বলছি আমি। এই সময়ে তরুণ কবিদের গোটা সাতেক কবিতার বই বেরিয়েছে যেগুলো রূপে ও স্বাদে বেশ আকর্ষণীয় এবং যেন এক আগন্তুক ঋতুর প্রতিধ্বনি বহন করছে। এটা যথেষ্ট আশাপ্রদ সন্দেহ নেই, তবু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য যে, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প প্রবন্ধ, সমালোচনার মধ্যে জাতীয় সত্তার যে সর্বাবয়ব পরিণত রূপটি পল্লবিত হয়ে ওঠে, তার অনুপস্থিতি সত্যই দুঃখজনক। এর অর্থ কি আমাদের প্রতিভার অভাব? না উদ্যোগ ও সাধনার?

এর উত্তর আমরা খুঁজবো। প্রথমে, মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতা কিভাবে সঞ্চিত হয়েছে, তা বিচার করে দেখা প্রয়োজন। গণহত্যার মুখে ও মুক্তিযুদ্ধের আগুনের মধ্যে লেখকরা দুইটি প্রধানক্ষেত্রে ছিটকে পড়েছিলেন : এক, কিছুসংখ্যক যারা আত্মরক্ষার্থে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে আশ্রয়গ্রহণ করেন এবং দুই, যারা দেশের ভিতরে থেকে গেলেন শহরে বা জনপদের ভিতরে।

প্রথমদল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো, বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠন। তারা

সভা-সমিতি করেছেন, লিখেছেন, ভ্রমণ করেছেন। ভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতরে অন্তত জীবনের নিরাপত্তাটুকু ওরা পেয়েছিলেন এবং তাকে অনেকেই ভালোমতোই কাজে লাগিয়েছেন। বাংলার বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকা ছিলো গুরুতর। বাংলাদেশের সংগ্রামকে তারা প্রত্যক্ষভাবেও সাহায্য করেছেন বিশেষ করে স্বাধীন বাংলা বেতারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান মারফত। এটা সত্য, তবু এও ঠিক যে ওদের অভিজ্ঞতা মূলত আন্দোলন, যদিও কলকাতা প্রবাস ও শরণার্থী শিবিরের দৃশ্যাবলী এপিকের পরিচ্ছেদ হিশেবে ব্যবহৃত হোতে পারে। অপরপক্ষে যারা দেশের ভিতরে ছিলেন তারাই অভিজ্ঞতার সত্যিকারের ভাণ্ডারী, কারণ তারা যেখানেই থাকুন, শহরে কিংবা গ্রামে, এ সমস্ত আলোড়নের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন ঝটিকা-উত্তল নদীর ভিতরে যেমন মাছ। তারা শত্রুপক্ষের অপারেশন দেখেছেন, গণহত্যা দেখেছেন, মৃত্যুর মুখোমুখি প্রতিমুহূর্তে তারা বেঁচে থেকেছেন। তারা দেখেছেন ঘৃণা, দুর্জয় প্রতিরোধ। দেশের জন্য, আদর্শের জন্য, মানবতার জন্য, আত্মত্যাগের অপার মহিমা। অস্তিত্বের এই বিচিত্র অবস্থা ও সমতলে-অতলে ওঠা-নামা মহত্তম অভিজ্ঞতার চরিত্রসম্পন্ন।

শিল্পকলা রচনার জন্য অভিজ্ঞতার এইরূপ সংগঠন যেমন একটা পূর্বশর্ত তেমনি এটুকুই শেষ নয়, তাও ঠিক। আমি, মনে হয়, অন্যত্র কোথাও বলেছি, শিল্পী ও অধ্যাত্ম-সাধকের মধ্যে তফাৎ এই যে, শিল্পীর সাধনা নিমজ্জন থেকে প্রত্যাবর্তন কিন্তু সাধকের সমাধি। শিল্পীর প্রত্যাবর্তনেরই অন্য নাম সৃষ্টি। অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতে না পারলে সে অভিজ্ঞতা লেখকের ব্যক্তিজীবনকে অবশ্য সমৃদ্ধ করতে পারে কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে তা নিরর্থক। তার মানে, যতক্ষণ না আমরা রচনা পাই ততক্ষণ লেখকের অভিজ্ঞতা আমাদের বিচারের আওতায় আসে না। অভিজ্ঞতা লেখায় রূপ নিলে সে হয় শিল্পবস্তু। বিভিন্ন রচনায় বিভিন্নভাবে, কোথাও গভীর, কোথাও হালকা, কোথাও বিষণ্ন উজ্জ্বল কোথাও অভিজ্ঞতা রূপায়িত হতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই একটা জিনিস সত্যি তা হোলো শিল্পীর অস্তিত্বেরই অংশ যে অভিজ্ঞতা তাকে কিঞ্চিৎ দূর থেকে দেখবার ক্ষমতা থাকা চাই। প্রথম স্তরে, ক্রোচে যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, অনুভব থাকে নিশ্চেতন, দ্বিতীয় স্তরে অনুভব সম্বন্ধে মানুষের চেতনা আসে কিন্তু তখনো তা আবেগ-উত্তেজনা-বিজড়িত,

এবং পরিশেষে নিস্পৃহতা। কিন্তু এই নিস্পৃহতার অর্থ সার্বিক বিয়োজন নয়ঃ এই নিস্পৃহতার অর্থ মননশীলতাকে জাগ্রত রেখে আবেগ-অনুভূতির পুনসৃষ্টির ক্ষমতা। আবেগের আদিমতা ও চৈতন্যের কল্পনাময়তার সঙ্গেই রয়েছে কাব্যের তথা শিল্পকলার যোগ, কিন্তু শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য এরা সামঞ্জস্যেরও মুখাপেক্ষী।

লাঞ্ছনা ও মৃত্যুর যে আবর্তে আমরা পড়েছি, ঘৃণা ও প্রতিশোধের যে আগুনে আমরা পুড়েছি তার মধ্যে যথেষ্ট ভাবাবেগ ও উত্তেজনা স্থায়িরূপে থাকবে এটাই মানবিক এবং স্বাভাবিক, কিন্তু এখানেই থামলে শিল্পরচনা সম্ভব নয়। লেখকের লক্ষ্য মানবতা, সুতরাং বাংলার ট্র্যাজেডিকে লেখক মানবতার ট্র্যাজেডি হিসেবেই গ্রহণ করবেন। এমনকি তার ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনা এবং ক্ষতিকেও মৌলিক মানবভাগ্যের পটে ফেলতে হবে, যদিও সে বিন্যাস অত্যন্ত কঠিন। এই পরিণত দৃষ্টিভঙ্গিটি যে একান্ত দুরাশা নয়, বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ কবিরা ইতিমধ্যেই তা দেখিয়ে দিয়েছেন, এবং অন্যান্য মাধ্যমে যে কাজ চলছে তার মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্যটি সাহিত্যের মূলরেখা হিসেবে ফুটে উঠবে তাতে আমি নিঃসন্দেহ।

গল্প রচনার মরশুম দেরিতে আসছে তাতে হতাশার কিছুই নেই, কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্যের উপরে যে একটা সংকট ছায়া ফেলেছে তাই আসল সমস্যা। এক বছর তিনমাস সময়ের মধ্যে একটিও উপন্যাস প্রকাশিত না হওয়াটা নিশ্চয়ই সংকটের লক্ষণ এবং এটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত মাত্র। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশে পনেরো মাসে পনেরোটিও বই বের না হওয়ার কারণ কেবল সাহিত্যগত হতে পারে না। তার মানে পরিবেশটাই প্রতিকুল ; বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা অধ্যাপক নিহত হওয়ার ফলে প্রবন্ধ, নাটক ও সমালোচনা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এই ক্ষতি অপূরণীয় ; দ্বিতীয়ত, মুদ্রণ উপকরণের অভাব, কাগজ নেই, প্রেস দুষ্প্রাপ্য এবং তৃতীয়ত যেহেতু লেখকরা প্রধানত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, যুদ্ধোত্তর দুর্মূল্যের ধাক্কায় তারা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করছেন, যার অনিবার্য ফল নৈরাশ্য ও নিষ্ক্রিয়তা। উপরন্তু সরকারী চাকরিতে যারা আছেন তাদের সামনে রয়েছে অনুমতিসংগ্রহের প্রতিবন্ধক। পাঠক-রুচির কথা নাই বা তুললাম, তাদের বিরুদ্ধে যাই বলা হোক না, ভালো লেখাকে তারা অবহেলা করবেন, এটা

হয় না। কিন্তু পাঠকরা এখন নতুন রচনা পাচ্ছেন না পড়বার জন্য, এটাই তো বাস্তব ঘটনা। মোট কথা, সব মিলিয়ে পরিবেশটা যা হয়েছে তাকে বলা যায় সাহিত্যবিরোধী।

বিপ্লবের ধারাকে জাতির রক্তে অব্যাহত রাখতে না পারলে এই সাহিত্য-বিরোধী পরিস্থিতি ক্রমে আরো প্রকট হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য এখন থেকেই প্রয়োজন সাহসী, মুক্তবুদ্ধি তরুণ লেখকদের অগ্রাভিযান। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নিরেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সেখান থেকে সৃষ্টিশীল, উর্বর কিছু পাওয়া অসম্ভব। এটা চরম দুর্লক্ষণ। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে এগুলো জাতির সম্পত্তি, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের নয়, সুতরাং এদের মধ্যেকার নিষ্ক্রিয়তা দূর করে এদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে হবে। নির্লজ্জ তোষামোদে, চরম সুবিধাবাদী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা ব্যক্তিগত উচ্চাশার ক্ষেত্র অন্যত্র খুঁজুক, তাদের লালসা নিবৃত্তির জন্যই কি তিরিশ লক্ষ সোনার মানুষ প্রাণ দিয়েছে? না, না, ককখনো নয়। নতুন নেতৃত্ব চাই, সাহিত্যেও এবং একমাত্র মুক্তির কাজল চোখে মাখা বিপ্লবী তরুণই দিতে পারে সেই নেতৃত্ব।

এভাবেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য সাময়িক আন্দোলন হবে না, হবে মানবাত্মার চিরায়ত অগ্নিপ্রবাহ।

১৯৭৩

চেতনার বিশ্বস্রোত ও সাহিত্য

চেতনার বিশ্বস্রোত থেকে কোনো দেশের শিল্পসাহিত্যকেই আর বিচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব নয়।

সত্তার অনন্তত্ব ও তার মহাজাগতিক ঐক্য গ্রীক্ চিন্তাধারায় প্রণালীবদ্ধ হলেও সে সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা আরো প্রাচীন। প্লেটোর ভাবনায় অবশ্য রাষ্ট্র প্রাধান্য পেয়েছে; তবু পরমের সঙ্গে প্রকৃতির স্তরগত সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মানবও জড়িত এবং এখানে দৃষ্টিভঙ্গির খর্বতা থাকলেও, সৌন্দর্যতত্ত্বে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এইভাবে কালের গতির সঙ্গে দার্শনিক পটভূমি ক্রমেই বেড়েছে; কিন্তু শিল্পকলায় যে তত্ত্ব প্রথম সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তা অনেকটা আধুনিক; এবং সে হলো, ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞান, বিশেষত তার স্বপ্নতত্ত্ব: তার সঙ্গে য়ুংয়ের চৈতন্যভাণ্ডার ও প্রতীক ব্যাখ্যারীতি। আর এইসব ভিত্তি পেয়েছিলেন বলেই পরাবাস্তববাদীরা (স্যুররিয়্যালিষ্ট) স্বয়ংক্রিয় রচনা-পদ্ধতির চরমে পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিলেন।

এখন পৃথিবীর যে-কোনো ভাষার একজন সচেতন লেখক, যার মাধ্যমে প্রথমেই বিশ্বস্রোতের সঙ্গে যুক্ত তা মনোবিকলন ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। উৎপত্তির পর থেকে অনেক দেশেই, শিল্পকলা ও সাহিত্যের সৃষ্টি ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ ঘটেছে যার অনুসন্ধান জ্ঞানচর্চার একটি সুন্দর বিষয় হতে পারে।

এটা সত্য। কিন্তু এরই মতো সত্য আরেকটি জিনিস তা হলো, চেতনার বিশ্বস্রোত প্রবাহিত থাকলেও আমরা পাই না বিশ্বসাহিত্য। আমরা পাই ইংরেজী সাহিত্য, ফরাসী সাহিত্য, রুশ সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য। নাচ ও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মনে হয় বিচ্ছিন্নতা কিঞ্চিৎ কম, যেমন আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত, প্রাচ্যসঙ্গীত—যদিও এর মধ্যে জাতিবিশেষের বিশিষ্ট অবদান চিহ্নিত করা সম্ভব। তেমনি চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্যের ভাব ও রূপ বর্তমানে অনেকটা আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু এর অর্থও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রচনাপদ্ধতি ও রীতিসমূহের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। তার মানে অন্যত্র অন্য ধারাও আছে; কিন্তু ছায়ার মধ্যে, অস্পষ্টতায়, অনুশীলন তাদের যেহেতু আনুপাতিকভাবে কম।

বিশ্বমানবতার ঐক্য এবং একটি সমন্বিত বিশ্বসভ্যতা মানুষের বহুকালের স্বপ্ন; স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ব তার বৈপ্লবিক সাধনা। কিন্তু সাহিত্যে তার প্রতিফলন কতখানি? দেশে দেশে ভাষা ভিন্ন। সাহিত্য বিভিন্ন। সেইসব ভাষার কোনো কোনো লেখকের রচনায় অবশ্য জাতি-উত্তরণ লক্ষণীয়, কখনো কখনো; কিন্তু তা মূলত ব্যক্তি-উদ্যোগ। তা'হলে প্রশ্ন, এমন কোনো উপায় আছে কি না যা দিয়ে আমরা এগুতে পারবো কেন্দ্রের দিকে? পৌঁছতে পারবো ঝর্ণাধারার কাছাকাছি? এর জবাবে প্রথমেই আমাদের মেনে নিতে হবে টেকনোলজির যত উন্নতিই হোক বিশ্বভাষা বলে কোনো ভাষার আবিষ্কার ও তার প্রয়োগ অসম্ভব এবং বোধ হয় তা কাম্যও নয়—কারণ একটা দেশের ভাষা তার জীবনের প্রতিচ্ছবি — সংস্কৃতি ও সভ্যতার পরিচয়। সেই ভাষা থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করার অর্থ হবে তার অপমৃত্যু। অবশ্য সুদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের আরো বিস্ময়কর গুণগত রূপান্তরের ফলে যদি হয় মৃত্যু-জরা পরাজিত এবং পৃথিবীর সব অঞ্চলের মানুষ থাকে একই রকম জীবনাচরণগত সুযোগ-সুবিধার পরিবেশে, তখন সহজ কোনো যান্ত্রিক ভাষার জন্ম হতেও পারে। কিন্তু মুশকিল, তখন হয়তো সাহিত্য ও শিল্পকলার কোনো

প্রয়োজনই থাকবে না। অতএব মানবসমাজের সে-রকম পরিস্থিতি আমাদের বিবেচনার বাইরে।

চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই ঘুচে যাচ্ছে, সৌন্দর্যতত্ত্বের দিক থেকে তা শুভলক্ষণ নিশ্চয়ই নয়, কারণ শিল্পকলার মুক্তি বৈচিত্র্যে ; কিন্তু মানব-ঐক্যের দিক থেকে তা অভিনন্দনযোগ্য ।

সাহিত্যে বিভিন্নতা আছে এবং তা থাকবেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রকাণ্ড সমৃদ্ধ গাছকেও আমরা চাই।

সেই লক্ষ্যে পৌঁছার একটি প্রধান উপায়, ক্লাসিকের তরজমা। এবং এটা খেয়ালখুশি নয়, হবে একটা সংগঠন, সম্ভব হলে অন্তত তার আর্থিক অংশ রাষ্ট্রপরিচালিত। কি তরজমা করবো আমরা? কোন বই? এর দুটো ভাগ থাকতে পারে, প্রথম সেই সমস্ত বই যেগুলো প্রাচীন সভ্যতার অঙ্গ এবং সহজেই মানবীয় সম্পদ বলে বিবেচিত। যেমন মৃতদের বই- 'গিলগামেশ উপাখ্যান'। এরিস্টটলের নন্দনতত্ত্ব ; হোমার, কালিদাসের কাব্য। কিংবা সোফোক্লিস ইউরিপিদিসের নাটক। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর উন্নত ভাষাসমূহের পরিচিত ক্লাসিক। গোড়ায়, পাশ্চাত্যের করেকটি ভাষা আমরা বেছে নিতে পারি —যেমন ইংরেজী, জার্মান, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনিস ; এবং তেমনি প্রাচ্যের যেমনআরবী, রুশ, চীনা, জাপান, ইন্দোনেশীয়। দুটি ভাষা থেকে তিনটি করে বই বেছে নিলে প্রথম অবস্থায় এখানে মোট তিরিশটা বই আমরা পাই ; এবং আগের তালিকায় দশ হলে, বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট চল্লিশ।

এখানেই সংগঠন --বই বাছাই এবং সেগুলোর সজীব তরজমার ব্যবস্থা, তার অন্তর্গত।

এর মধ্য দিয়ে চেতনার বিশ্বস্রোতকে আমরা দু'ভাবে স্পর্শ করতে পারছি।

প্রথম, ভাবনাধারায় অবগাহন। নির্বাচিত ক্লাসিকে যে মানবপ্রসঙ্গ তার মধ্যে স্থান ও কালগত চরিত্র থাকলেও স্থানকালপাত্রের গণ্ডিকে ছাড়িয়ে যাওয়াই তার মৌলিক বিশেষত্ব। এবং তার ভাষান্তরিত রূপের মধ্যে গাঢ়তা থাকবে না সে আশংকা অমূলক, কারণ এখানে রীতি কিংবা

শৈলীগত রূপান্তর উদ্দেশ্য নয় যদিও ক্ষমতাবান অনুবাদকের হাত থেকে আমরা তার প্রতিরূপও পেতে পারি।

ক্লাসিক অনুশীলনের দ্বিতীয় গুরুত্ব হবে নিজের ভাষার মধ্যে অব্যাহত প্রজনন-উৎসাহ। বলা বাহুল্য, এই ধরনের বৈদগ্ধকে সম্ভব করে তোলার জন্য প্রয়োজন শোষণমুক্ত সমাজ এবং অবাধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ। বর্তমানে পৃথিবীর মানবসমাজ মোটামুটি ত্রিধাবিভক্ত---ধনবাদী শিল্পসমাজ, সমাজতন্ত্রী সমাজ এবং গণতন্ত্রী সমাজ। ধনবাদী শিল্পসমাজে সাম্যের অভাব, সমাজতন্ত্রীসমাজে চিন্তার স্বাধীনতা খর্বিত বলে অভিযোগ এবং গণতন্ত্রী সমাজ এ-দুয়ের উদ্ভট সংমিশ্রণ। মানুষ সৃষ্টিশীল থাকলে সে উদারনৈতিক সাম্যবাদে গিয়ে পৌঁছবেই; কিন্তু তার আগ পর্যন্ত যে কর্তব্য তাই কঠিন। সংগ্রাম চলছে সুষম মানবতার পক্ষে; কিন্তু গন্তব্যে যাওয়ার আগে তার যে অংশ আমি তার নাম দেবো. সাধনা। সাধনার মধ্য দিয়ে এবং কখনো কখনো সাহসী মোকাবেলা মারফত বিরূপকে পরাজিত করে ক্রমশ অগ্রসর হবো লক্ষ্যের দিকে। কুসুমচয়ণে হাত রক্তাক্ত হোলেও, তা আমাদের কাম্য বৈকি।

১৯৭৩

ভাষার দ্বিতীয় সংগ্রাম

কাগজে-কলমে কোন কিছুর স্বীকৃতি আর তার বাস্তব প্রয়োগ, দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, ইতিহাসের স্তরে স্তরে চলেছে বাংলাভাষার সংগ্রাম, নানা আক্রমণ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, এবং বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারী তারিখে তা এক চরম বিন্দুতে পৌঁছেছিলো, যেখানে তাজা বুকের রক্তের বিনিময়ে এমন এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি হলো, যার অর্থ বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠা; কারণ জীবন ও ধ্বনিমালা একই অবিচ্ছিন্ন স্রোত।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আমরা দেখেছি, আমাদের ভাষাও ছিলো মুক্তিযোদ্ধা।

অতএব, স্বাধীনতার পরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংবিধানে তার স্বীকৃতির মধ্যে অতিরিক্ত কিছু নেই। এই স্বীকৃতি কোন দল বা গোষ্ঠীর 'অবদান' নয়। এই স্বীকৃতি একটি অবিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক সংগ্রামেরই পরিণতি—সে সংগ্রামের সৈনিক আবহমান বাংলার জনসমাজ।

বাংলাদেশ এখন সপ্তম বৃহত্তম রাষ্ট্র এবং বাংলাভাষা পৃথিবীর অষ্টম ভাষা। স্বাধীন একটা দেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। সুতরাং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পরে, এখন যা কর্তব্য তা আরো গুরুতর, আরো সুদূরপ্রসারী, আরো প্রচণ্ড। এক সংগ্রাম শেষ হয়েছে

স্বাধীনতা অর্জনে. এখন আমাদের শুরু করতে হবে দ্বিতীয় সংগ্রাম, যা দাবি করে আরো কঠোর আত্মত্যাগ এবং সাধনা।

ভাষার দ্বিতীয় সংগ্রামে তিনটা ধারা সহজেই আমরা চিহ্নিত করতে পারবো। প্রথম ব্যবহারিক, যার অর্থ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রয়োগ। তার মধ্যে চারটি প্রধান: শিক্ষা, আইন-আদালত, সরকারী অফিসের কার্যনির্বাহ এবং বহির্বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার সক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হয়; কিন্তু তা সম্পূর্ণ অমূলক। উচ্চশিক্ষার পারিভাষিক শব্দাবলী সবদেশেই মূলত গ্রীক ও ল্যাতিন-মূলীয়,-যেগুলোকে আমরাও অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি। উচ্চশিক্ষার বিবরণাত্মক দিকটিকে বাংলা ভাষা সহজেই ধারণ করতে সক্ষম। সরকারী অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ক্রান্তিকালে কিছু কিছু বিদেশী শব্দের ব্যবহার চালু রাখতে হবে, এটা কোন দোষের ব্যাপার নয় বরং বিদেশী ভাষা, শব্দ ও প্রকাশভঙ্গি হজম করতে পারা শক্তিশালী ভাষার একটি প্রধান লক্ষণ।

দ্বিতীয়ত, গবেষণা: বাংলা ভাষার উৎস সন্ধান, তার ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয় এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ে নতুন যুগের আলোকে নতুন করে গবেষণার প্রয়োজন আছে। বাংলা ভাষা বিষয়ে উনিশ শতকী সিদ্ধান্তসমূহ সন্দেহজনক; বিশ শতকী মন্তব্য বিতর্কমূলক। সুতরাং যে যত বড় পণ্ডিতই হোক, এখন আমরা অন্ধভাবে তাঁদের সব কথা মেনে নিতে পারি না। নতুন গবেষণার প্রাথমিক সূত্র হিসেবে একটি প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম:

১। একদিকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত এবং অন্যদিকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের উপভাষা, মাঝখানে বাংলাকে রেখে তাঁদের বাক্যরীতি, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব ও ছন্দগত তুলনামূলক বিচার;

২। নেপালী, তিব্বতী, চৈনিক কিংবা বর্মী ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোন প্রাচীন উপাদান অনুলিখিত আছে কি না সে সম্পর্কে অনুসন্ধান।

৩। সমতটীয়, মানে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ফরিদপুর ও দ্বীপাঞ্চলের বর্তমান গণবুলির নতুন বিশ্লেষণ। তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আদি বঙ্গভাষার অন্বেষণ করা দরকার এবং এই মৌলিক ও দুরূহ কর্তব্য

সাধনের জন্য প্রয়োজন সরকারী অর্থপুষ্ট একটি আলাদা গবেষণা সংগঠন। তার পরিচালনায় একটি গবেষকমণ্ডলী সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত থাকবেন।

ভাষার দ্বিতীয় সংগ্রামের আরেকটি প্রধান কেন্দ্র সৃজনশীল সাহিত্য। গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, কবিতায় সৃষ্টির অবারিত ধারার মধ্যে আমরা বাংলা ভাষাকে নতুন রূপে, নতুন বেশে, নতুন সাজে পেতে পারি। পেতে পারি নতুনতর অর্থে, নতুন গভীরতায়। এই সৃজনশীলতার মৌসুম অবশ্যই ব্যক্তিপ্রতিভার জন্ম, কিন্তু এখানে সামগ্রিক পরিমণ্ডলের অবদানও চাই। বসন্তকালের মধ্যেই কেবল অজস্র ফুল ফুটতে পারে এবং মানব-সমাজে সেই বসন্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। এবং এটা কারুর একার ব্যাপার নয়, নয় কেবল রাজনৈতিক দলের কিংবা শুধু সরকারের। এখানে প্রত্যেকটি মানুষের সমান কর্তব্য রয়েছে, সে যত ছোট গণ্ডিতেই নিয়োজিত থাকুক না কেন। এখানে রয়েছে শ্রমিকের কাজ, কৃষকের কাজ, শিক্ষকের কাজ, শিল্পীর কাজ। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীর কাজ। জাতির প্রত্যেকটি সদস্য উন্নত না হলে জাতি উন্নত হয় না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাষার নতুন আবিষ্কারের একটা অর্থ হলো সমকালীন, চলতি গণবুলির নতুন আবিষ্কার এবং নির্বাচিত জীবন্ত উপাদানের নতুন নতুন প্রয়োগ। এইটি সাহিত্যের সংকটমুক্তিরও একটি মৌলিক উপায়। অতিবৈদগ্ধ্য আমাদের তরুণ কবি ও লেখকদের আচ্ছন্ন করেছে, তা নিঃসন্দেহে দুর্লক্ষণ। জীবনের সামগ্রিক বিপর্যয় এর জন্য দায়ী হলেও এই অবস্থা থেকে উৎক্রান্তিরও প্রয়োজন আছে সেজন্য। আমি তরুণ বন্ধুদের কাছ থেকে আরো সজ্ঞানতা চাই ; চাই আরো আন্তরিকতা ও পরিশ্রম। তাঁদের বেশীর ভাগই অত্যন্ত শক্তিশালী ; তাঁদের সাধনায় বাংলা ভাষা নতুন সৌন্দর্যে ও সম্ভাবনায় মঞ্জরিত হয়ে উঠবে, আমি তা বিশ্বাস করি।

অতএব, বলতে পারি বাংলা ভাষার প্রথম সংগ্রামে আমরা জয়ী হয়েছি, তার দ্বিতীয় সংগ্রামেও আমরা পরাজিত হবো না।

১৯৭৪

ধ্রুপদী রচনা ও চলচ্চিত্র

শিল্পকলার প্রকাশমাধ্যম বিভিন্ন হতে পারে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পরিণত সৃষ্টির পূর্বশর্ত প্রায় এক, সে সম্পর্কে সজাগ থাকা সমকালীন সমালোচনার একটি প্রাথমিক কর্তব্য। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের গুণগত উৎকর্ষের সম্ভাবনা বিষয়েও এই সত্য স্মরণীয়। স্মরণীয় বিশেষ করে এই কারণে যে, আমাদের তৈরী ছবি সম্পর্কে বুদ্ধিজীবিমহলে এক চরম উন্নাসিক মনোবৃত্তি চালু রয়েছে। সিনেমায় কালজয়ী রচনা অবশ্য আমরা এখনো পাইনি, কিন্তু তাই বলে সব ছবিই 'জঘন্য' নয় কিংবা নয় দেখার অযোগ্য। উপরন্তু ভালো রচনার জন্য তরুণরা যে ভাবছেন, আলোচনা করছেন এবং নানান প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিচ্ছেন, তাও নিরর্থক নয়।

সাহিত্যে ক্লাসিকের জন্মবিষয়ক প্রস্তাবে এলিঅট যে শব্দটির উপরে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা'হলো 'পরিণতি' (**maturity**) ; এবং বলেছেন, ক্লাসিক একমাত্র তখনই সম্ভব হোতে পারে যখন একটি সভ্যতা পরিণতি পায় ; যখন একটি ভাষা ও সাহিত্য হয় পরিণত এবং অবশ্যই তা'কে হতে হবে এক পরিণত মনের কাজ।[১] এই পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই, একটি সভ্যতার পরিণত অবস্থার সঙ্গে ধ্রুপদী রচনার শর্ত আরো তিনটি পরিণতির বিমিশ্রণ—তা প্রকাশমাধ্যম, ঐতিহ্য ও

---

[১] এলিঅট, টি. এস.—'হোয়াট ইজ এ ক্লাসিক' ফেবার এ্যাণ্ড ফেবার, পৃঃ ১০

ব্যক্তিপ্রতিভা। সাহিত্যের প্রকাশমাধ্যম ভাষা—ভাষার পরিণতির লক্ষণ কি? না, যুগপৎ সরল ও জটিলের, স্থূলও সূক্ষ্মের, সমতল ও গভীরের ধারণক্ষমতা—যেখানে অনর্গল তীব্র গভীর ভাবাবেগ ও বিশুদ্ধ মননশীলতা সমান গতিবেগ লাভ করে। বাকী দু'টি বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায় পরিণত সাহিত্যে সমন্বিত হয়—আদিমতা ও বৈদগ্ধ এবং পরিণত মনের লক্ষণ আবেগ ও বুদ্ধির সামঞ্জস্য এবং জীবন সম্পর্কে ট্র্যাজিক চেতনা।

ভাষার প্রাচীনতা ও অনন্তত্ব সাহিত্যকে দিয়েছে বহুমাত্রিক সম্ভাবনার ক্ষেত্র কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পকলার প্রাঙ্গণে এক নবীন আগন্তুক, যার শৈলীগত প্রসার মূলত রাসায়নিক ও কারিগরী বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপরে নির্ভরশীল। ভাষার লিখিত রূপ সাহিত্যের বাইরেও ভাষার একটি পরম অস্তিত্ব রয়েছে; কিন্তু সিনেমার প্রকাশ-মাধ্যম ফিল্‌ম এখনো পর্যন্ত, সহজেই প্রকৃতির ধ্বংসশীলতার অধীন। পেপিরাসের পাণ্ডুলিপির বয়স প্রায় পাঁচ হাজার বছর এবং গিলগামেশ মহাকাব্যের, ইষ্টকলিপির সোয়া তিন হাজার; কিন্তু প্রথম যুগের ছায়াছবির অনেক রীল এখনই দুষ্প্রাপ্য—কিংবা প্রায় নষ্ট। অথচ প্রকৃত চলচ্চিত্রের বয়স পঞ্চাশ বছরের বেশী নয়। সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে গতি নেই সেই গতির মায়া সৃষ্টিই সিনেমা।[৩] একটি অবিচ্ছিন্ন ফিতের উপরে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিমূর্তিমালা, যা গতির ধারাবাহিক স্তর প্রকাশ করবার মতো সময়ের বিরতিতে মুদ্রিত হয়েছে—আসলে ব্যাপারটা তো এই। এই ছবিগুলোকে যখন মানবদৃষ্টির একীভবনসমিদ্ধ পুনর্পৌনিকতার ঊর্ধে দ্রুততার সঙ্গে দেখানো হয়, তখন তা দর্শকের মনে এক সংযুক্ত গতি হিসেবে দেখা দেয়।[৪] ইংরেজীতে সিনেমাকে বলা হয়

২। মনট্যাগু, আইভর- ফিল্‌ম ওয়ার্ড', পেনগুইন বুক্‌স, পৃঃ ৬২

৩। ঐ পৃঃ ১৪—'The cinema is an illusion of movement that is not there.

৪। মাইকেলিস, এনথনি আর—রিসার্চ ফিলমস, একাডেমিক প্রেস, ১৯৫৫—'A series of separate images recorded on the same continuous ribbon and exposed at standard intervals of time, to represent successive phases of movement; when exhibited in rapid sequence above the fusion frequency of human vision, the separate images persist long enough in the mind of the observer to reproduce the appearance of continuous motion.'

'মোশন পিকচার' (motion picture) মানে গতিশীল ছবি। এর অর্থও আমরা বুঝতে পারি, প্রথমত, এ 'ছবি'- আসল জিনিসটা নয়, তার প্রতিবিম্ব, এবং দ্বিতীয়ত, তা গতির রূপকে প্রকাশ করে। সুতরাং অন্যান্য শিল্প-কলার মতই চলচ্চিত্রও জীবন নয়, জীবনের প্রতিচ্ছবি।

ফিলমের দ্রব্যগত সীমাবদ্ধতা যেমন সত্য, তেমনি তার প্রকাশক্ষমতার কতকগুলো বিশেষত্ব রয়েছে যা তার অনন্যশক্তির উৎস হিসেবে দেখা দিতে পারে। চিত্রকলায় রেখা ও রঙের টানে, গতির মায়া সৃষ্টি করতে পারি, কিন্তু চলচ্চিত্রে প্রকৃত গতিকেই আমরা দেখতে পাই। এবং এই তার প্রধান বিশেষত্ব যার নাম আমরা দিতে পারি বাস্তব-প্রতিমতা। দ্বিতীয়ত, পরবাস্তবতার উদ্ভট আজগুবি বিদ্ঘুটে ভয়ংকর সাহিত্যে ও চিত্রকলায় যার সামান্য প্রকাশই সম্ভব, সিনেমায় তাকে এমনভাবে ধরা যেতে পারে যাকে মনে হবে যেন 'সত্য'। প্রাচীন কল্পনা এবং আধুনিক অবচেতন মনের রহস্য-লীলাকেও এমনিভাবে পেতে পারি। তৃতীয়ত, নিপুণ অভিনয় ও মনটাজের বিশেষ ব্যবহার মারফৎ মনস্তাত্বিক সূক্ষ্মতা ও গভীরতাকে চলচ্চিত্রে যতটা আবেদনগ্রাহ্যরূপে পাওয়া যেতে পারে অন্য কোন শিল্পমাধ্যমে তা সম্ভব নয়। এ বিশেষত্বগুলোই চলচ্চিত্রকে শিল্পকলার জগতে নিয়ে এসেছে; এবং ক্যামেরার কলাকৌশলগত ক্রমোন্নতি ও লেন্সের নতুন নতুন রূপান্তর, তার নন্দনতাত্ত্বিক সম্ভাবনাকে যে দিন দিন আরো বাড়িয়ে তুলছে তাও নিঃসন্দেহ।

চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো, মূলত প্রমোদ-উপকরণ হিসেবেই তার জন্ম এবং প্রথম দিকে তার উৎপাদনের লক্ষ্য ছিলো সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক। কিন্তু আস্তে আস্তে ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে এবং এখন সে শুধু প্রমোদ নয়, অভিজ্ঞতাও। যেখানে প্রমোদ, সেখানে সে প্রমোদ কিন্তু কখনো কখনো অন্য জিনিসও হোতে পারে, যেমন ট্র্যাজেডি, গ্রীকভাষ্যে যার অন্য নাম আনন্দ।

চলচ্চিত্রে ধ্রুপদী রচনা কিংবা শিল্পচিত্র (art film) তৈরী সম্পর্কে সুতরাং আমার প্রথম বক্তব্য, প্রমোদশীলতা ও বাণিজ্যিক চরিত্র এখানেও এক মৌলিক শর্ত। কখনো কখনো প্রমোদশীলতা অবশ্যই সমন্বিত হবে অভিজ্ঞতার মধ্যে, এবং বিষাদান্ত ছবির পরিণতির মধ্যেও গ্রীক ট্র্যাজেডির

বিমোক্ষণজাতীয় বিন্যাস থাকা উত্তম, কারণ ছবির শেষে দর্শক যে পরিতৃপ্তির আশা করে তা থেকে তাকে আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত করতে পারি না। একটা হিন্দী ছবিতে দেখেছিলাম, পৃথিবীতে নায়ক-নায়িকার মৃত্যু হয়েছে; কিন্তু উপসংহারের গানের কথা হলো স্বর্গে তাঁদের মিলন হবে, এবং সেই সঙ্গে স্বর্গে সেই মিলন দৃশ্যের সুপারইম্পোজিশন। শিল্পরসিকদের কাছে জিনিশটা স্থূল মনে হতে পারে কিন্তু সিনেমার দিক থেকে এটা গ্রহণযোগ্য। দ্বিতীয়ত, চলচ্চিত্র যৌথশিল্প, যে বিশিষ্টতার সঙ্গে তার সৃজনশীলতার প্রশ্নটিও জড়িত। আমি কবি, ইচ্ছে করলেই লিখতে পারি, আমি গায়ক, ইচ্ছে করলেই গাইতে পারি, আমি চিত্রী, ইচ্ছে করলেই আঁকতে পারি, আমি ভাস্কর, ইচ্ছে করলেই গড়তে পারি—কিন্তু চলচ্চিত্র রচনা ইচ্ছে করা মাত্রই সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রের মতো নাটক এবং স্থাপত্যও যৌথশিল্প, নিজ নিজ জগতে যাদের নিজস্ব দাবিও আছে।

ব্যক্তিপ্রতিভা হিসেবে অন্যান্য মাধ্যমের শিল্পীদের যে একক অস্তিত্ব রয়েছে, চলচ্চিত্র মাধ্যমে তাদের সমান যদি একজনকে আবিষ্কার করতে হয়, তা'হলে তিনি নিশ্চয়ই পরিচালক। চলচ্চিত্রে পরিচালকই স্রষ্টা, যদিও প্রত্যেকটি সহযোগী অবদানেরই নিজ নিজ গুরুত্ব রয়েছে। পরিচালকই স্রষ্টা, সুতরাং তার সত্তার মধ্যেও সব শিল্পীর মতোই ত্রিধারার সমন্বয় হওয়া চাই। সে হলো অভিজ্ঞতা, কলাকুশলতা এবং সৌন্দর্য। পরিচালকের অভিজ্ঞতার অর্থ তার সিনেমার বিষয়-উৎস; কলাকুশলতা মানে অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন ভিত্তিগত গঠন ও ব্যাকরণ, এখানে তেমনি সিনেমার কারিগরি ও প্রয়োগগত দিক সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান; এবং সৌন্দর্য, শিল্পসৃষ্টির প্রতিভা। পরিচালকের কাজ খুবই কঠিন। এই দিক থেকে যে একদিকে কারিগরি এবং অন্যদিকে মানবিক, এই দুই উপকরণকেই সৃষ্টির সুর তাল-লয়ের মধ্যে তাকে সমন্বিত করতে হয়; ছবির ভাবনা সময় থেকে শুরু করে ছবি তৈরীর শেষ পর্যন্ত যুগপৎ নিয়ন্ত্রণ ও মুক্তির দ্বৈতক্রিয়ায় তার অস্তিত্ব ক্ষতবিক্ষত, স্পন্দমান।

বাংলাদেশে এখন ধ্রুপদী কিংবা শিল্পচিত্রের সম্ভাবনা আছে কিনা সে সম্পর্কে প্রথম একটি কথাই বলা যায়—তা হোলো প্রতিভার জন্ম প্রায়ই রহস্যজনক, এবং প্রতিভা কখনো কখনো ব্যতিক্রম যদিও শ্রেষ্ঠ

রচনার জন্য প্রয়োজন প্রতিভা ও সময়ের স্বর্ণযোগাযোগ। আমরা জানি প্রত্যেক শিল্পেরই জাতীয় ধারা রয়েছে এবং তার মধ্যে পরিণত সৃষ্টির কাল আসে জাতীয় জীবনের সবকিছুর আনুপাতিক পরিণতির মধ্য দিয়ে। কিন্তু আধুনিক স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রের বেলায় আরো একটা জিনিশ সত্য, তা হোলো ওদের আন্তর্জাতিক চরিত্র। সুতরাং একজন ইতালীয় সুইডিস ফরাসী কি আমেরিকান পরিচালকের ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বাংলাদেশের পরিচালকের পেছনেও রয়েছে একই ঐতিহ্য। কেবল গত পঁচিশ বছরের দেশীয় নয়, সিনেমার গোটা ইতিহাসের পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতা আমাদেরও অভিজ্ঞতা। পারীতে যদি ফুল ফোটে, ফোটে যদি রোমে, হলিউডে কি মস্কোতে, তবে ঢাকায় কেন ফুটবে না, তা আমি বুঝতে পারি না।

দেশীয় ঐতিহ্যটুকু যদিও ছোট, আমাদের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, আছেন দক্ষ কলাকুশলী এবং ক্ষমতাবান অভিনেতা-অভিনেত্রী; এই-সমস্ত উপকরণকে যিনি কাজে লাগাতে পারবেন তার অপেক্ষায় আমরা আছি। তিনি হবেন চলচ্চিত্র শিক্ষায় শিক্ষিত, প্রকৃত জ্ঞানী। তিনি হবেন পরিশ্রমী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর মধ্যে থাকবে প্রেমিকের মন, শিল্পীর দৃষ্টি, সাধকের ধ্যান। সর্বোপরি, তিনি হবেন মানব-প্রেমিক বিপ্লবী যার অন্যতম গুণ দুঃসাহস। আমি জানি তাঁর জন্মের যেমন বেশী দেরি নেই তেমনি তাঁর কাজেরও প্রধান গুণ হবে 'অপূর্বতা'। কিন্তু তবু একটি কথা বলতে ইচ্ছে হয়, তা হলো, ক্লাসিক কিংবা বিশিষ্ট রচনা, এমনকি ভালো রচনাও এক সর্ব-বিপরীতের সামঞ্জস্য। বিশেষত সিনেমা গণশিল্প বলে তার মধ্যে এই গুণের উপস্থিতি আরো বেশী করে প্রয়োজন। বাংলার জনগণের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, প্রেমবিরহ আশা-আকাঙ্ক্ষা সংগ্রামের অনন্ত প্রবাহে ডুব দিতে হবে, এবং তার ভিতর থেকে ছেঁকে তুলতে হবে ঝিনুক, নানা রত্ন, মণিমুক্তা লক্ষ্মী চাঁদ ঐরাবত॥

অতিবৈদগ্ধ্য বন্ধ্যাত্বের লক্ষণ। আমাদের নতুন ছবি যেমন অতিবৈদগ্ধ্যকে ছাড়িয়ে যাবে তেমনি সস্তা রুচি ও স্থূলতার শেকলেও বাঁধা পড়বে না। মাঝামাঝি রাস্তাই বসন্তের দরোজা। এই দরোজার দুটি মর্মরস্তম্ভ, হাস্যরস

এবং মরমীয়তা, যা বাঙালী-চরিত্রেরই বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত যৌন আবেদনময়তা হতে পারে এই হাস্যরসের বৃহৎ কাঠামোর নিয়ন্ত্রণাধীন, তেমনি অভিজ্ঞতার মধ্যে বহুবিচিত্র মাত্রা আনবে মরমীয়তা। এই দুই মেরুর মাঝখানে সৃষ্টির দোলকটি দুলতে পারলে তা সহজেই হবে আনন্দবেদনা ঐশ্বর্য-প্রাচুর্যের দর্পণ।

কান পাতলে আমি আমাদের চলচ্চিত্র অঙ্গনে নতুন ফাল্গুনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

১৯৭৪

তুলনামূলক সাহিত্য

তুলনামূলক সাহিত্য কি একটি স্বতন্ত্র শৃঙ্খলা অথবা এক শ্রেণীর সমালোচকের অনাবশ্যক আত্মপ্রসারের ক্ষেত্র ?

প্রশ্নটা স্বাভাবিক এদিক থেকে যে, তুলনা জিনিসটা কেবল সমালোচনার নয় ভাষারও প্রাণবস্তু। পৃথকীকরণ ও প্রতীক-ধর্মিতা থেকে ভাষাকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না তেমনি সাহিত্যও, তার উপাদান ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়া উভয় দিক থেকেই নিরন্তর বাছাইয়ের খাত বেয়ে চলে ; এবং তার রয়েছে, একই সঙ্গে, বহুমাত্রিক ক্রিয়াশীলতা। যেমন একজন লেখক যদি 'শিক্ষিত' (প্রকৃত লেখককে 'শিক্ষিত' না হয়ে উপায় নেই) হন, এবং তিনি হন একজন আধুনিক কবি, তা'হলে উপাদানের ক্ষেত্রে তাঁর মনে যে তুলনামূলক প্রবাহ চলে তার গতি গতানুগতিকতা থেকে অভিনবত্বের দিকে, সারল্য থেকে জটিলতায় ঃ আপন অভিজ্ঞতাকে, কতকটা যেন অভ্যাস বশতই, কোনো বিদেশী প্রতিরূপের পটে ফেলে যাচাই না করে নেয়া ইস্তক তাঁর স্বস্তি আসে না। তার প্রকাশ-মাধ্যম, অর্থাৎ ভাষা এবং শৈলীও, একই অবিচ্ছিন্ন সংগঠনের অংশ, প্রায়শই।

এই অনুপ্রবেশ ও অন্বেষণ চলতিকালের প্রায় সব প্রাগ্রসর সাহিত্যেরই সাধারণ প্রবণতা, যার প্রধান লক্ষ্য নিশ্চয়ই শিল্পমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এবং বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইমেজিজম, বিশেষ করে পাউণ্ড ও এলিঅটের

কাজের মারফত এ সম্পর্কে নতুন চেতনা এলেও, তার আদি উৎস অত্যন্ত প্রাচীন, এমনকি গ্রীক ক্লাসিকের আবিষ্কারের পথ ধরে ইউরোপীয় রেনেসাঁরও পূর্ববর্তী।

এইখানে যে ইঙ্গিতটি আমি করতে চাই, তা হলো সাহিত্যের স্বাভাবিক তুলানধর্ম এবং লেখক বিশেষের দুই বা ততোধিক ভাষাচারিতা, তুলনামূলক সাহিত্যের আলাদা সত্তার যৌক্তিকতাকে মোটেই দুর্বল করে না; বরং সে যেন তার অস্তিত্বেরই পরোক্ষ প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ তুলনাশীলতা ও আন্তর্ভাষা বিচরণের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উৎস থেকেই তুলনামূলক সাহিত্যের জন্ম; এবং একটি আলাদা বিদ্যা হিসেবে তার ক্রমান্বয় বিকাশ। গ্যোটের বিশ্বসাহিত্য (**Weltliteratur**) কল্পনা এবং ম্যাথু আর্নলডের বিশ্লেষণী অনুশীলন তার নিকটবর্তী ভিত্তি।

তুলনামূলক সাহিত্যকে কেবল সমালোচনার অন্য ধারা হিসেবে গণ্য করার অর্থ কিন্তু তার সম্ভাবনার পরিধি সংকোচনঃ কারণ সমালোচনার তুলনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন এবং খামখেয়ালী; কিন্তু তুলনাকে আলাদা শৃঙ্খলা হিসেবে গ্রহণ করা মানে গুরুতর ও ধারাবাহিক আত্ম-নিয়োগ। যেমন কোনো ভাষায় নতুন একজন আর্নলড জন্ম নিতে পারেন যিনি বলবেন, প্রত্যেক সমালোচককেই নিজের সাহিত্য ছাড়া অন্তত আর একটি বড় সাহিত্য আয়ত্ত করা উচিত—এবং সেটা তার নিজেরটা থেকে যত ভিন্ন হয়, ততই ভালো। এবং সত্য সত্যই তিনি কষ্ট করে অন্য ভাষা শিখবেন, এক বা একাধিক বিদেশী সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করবেন। এটা সম্ভব। কিন্তু তা একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যমেরই দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে। ধরা যাক, তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাবান; সে হিসেবে আপন ভাষায় একটি শক্তিশালী ঐতিহ্যও সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু তার পরবর্তী বিকাশের নিশ্চয়তা কোথায়? অপরপক্ষে, তুলনাকে একটি আলাদা শৃঙ্খলা হিসেবে মানলে সে দেশের উচ্চতম বিদ্যালয়ে তার আসনলাভ অনিবার্য। এবং তার অর্থ কতটা বাধ্যতামূলক চর্চা। সেক্ষেত্রে শিক্ষক দরকার, ছাত্র দরকার। দরকার বিদেশী ভাষা শেখার ব্যবস্থা; পাঠ্যপুস্তক, জাতীয় বাজেট। এবং এরকম একটা সুদৃঢ় ভিত্তি তার গুরুত্ব ও প্রবহমানতার রক্ষাকবচ।

তুলনামূলক সাহিত্যকে স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসেবে নেয়ার দার্শনিক তাৎপর্য মূলত তিনটি—আহরণ, সমন্বয় ও সৃষ্টি।

বর্তমানকালে, তরজমার মারফত বিদেশী সাহিত্যের অনেক ভালো রচনাই আমরা হাতের কাছে পাই; এর উপর, নতুন নতুন ভাষা শিখলে সেই সমস্ত ভাষার সারবস্তু সহজেই এসে যাবে আমাদের চোখের কাছে। এগুলো একান্ত ব্যবহারিক অনুবাদ, সন্দেহ নেই; তবু তা হবে যথেষ্ট মূল্যবান। এই যে অন্য ভাষার নির্বাচিত রচনাবলীর পাঠযোগ্য রূপান্তর তাকেই আমি বলছি আহরণ—বইয়ের জগতে যার সংখ্যাগত বিস্তৃতি একদিকে একটি ভাসমান তুলনাশীলতা অন্যদিকে আন্ত-উর্বরতার একটি অবস্থা। এরকম রচনা কার মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে আমরা জানি না; তবে সে যুগপৎ জ্ঞান ও প্রেরণার কারণ হতে পারে তা ঠিক। এগুলো দ্বিতীয় স্তর, মানে সমন্বয়ের সঙ্গেও বিজড়িত। সেখানে একটি প্রধান পরিচালক-শক্তি হচ্ছে সমালোচনা; সমন্বয়ের প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গে কোনো অন্ধ আবেগ ক্রিয়াশীল থাকতে পারে অবশ্যই; কিন্তু বেশিক্ষণ অচেতন থাকতে পারে না প্রকৃত সমন্বয়ের প্রক্রিয়া। সমন্বয়, একদিকে সমালোচক, অন্যদিকে শিল্পীর সজ্ঞান সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে রূপময়; এবং সে হিসেবে তা' তুলনামূলক সাহিত্যের শাঁস হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য, তা বলাই বাহুল্য; এবং সচেতন সমন্বয়ের স্রোত থেকে ফুটতে পারে, ফোটে সৃষ্টির শাপলা, লালকমল-নীলকমল।

তুলনামূলক সাহিত্যের উর্বরতা সঞ্চারের ক্ষমতা, তার বিশ্বমানব সংস্কৃতির ভূমিকা এবং তার আকাদেমিক ঔচিত্য সম্পর্কে, এখন আর কোনো প্রশ্ন না থাকলেও, সে যে এখনো উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করেনি তা মানতে আমরা রাজী। ইংলণ্ডের কোনো য়ুনিভারসিটিতেই তার জন্য কোনো আলাদা বিভাগ নেই, যদিও বিশেষ অধ্যাপকের সঙ্গে ব্যবস্থাক্রমে এই পদ্ধতিতে পড়াশুনা ও গবেষণা করা যায়; ইউরোপেও তার প্রসার নগণ্য; এবং সমাজতন্ত্রী দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েট ইউনিয়নে বিদেশী সাহিত্যের যথেষ্ট তরজমা হয়ে থাকলেও তা তুলনামূলক সাহিত্যের অঙ্গ নয়। এ ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম আমেরিকা, যেখানে তার প্রসার অন্তত চোখে পড়বার মতো। এর কারণ বোধ হয় আমেরিকান সংস্কৃতির বিশেষ অবস্থান।

সে একদিকে নিরন্তর ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে স্নানরতা, এবং অন্যদিকে ইউরোপের ক্লাসিক ছাড়াও, অন্তত ছয়-সাতটি জাতিগত নদী-প্রবাহে বিচরণ করছে, যেহেতু আমেরিকান এক বিমিশ্রিত জনসমাজ। এদিক থেকে হয়তো মিথ্যে নয়। আমেরিকান হয়ে জন্মাবার সুবিধে সম্পর্কে হেনরী জেমসের মন্তব্য (১৮৬৭): আমাদের নয় এমন সভ্যতার রূপ নিয়েও আমরা স্বাধীনভাবে নাড়াচড়া করতে পারি ; আমরা পারি কুড়িয়ে নিতে, বাছাই ও সমন্বয়, এক কথায় যেখানে যা পাই আমাদের সম্পত্তিরূপে তাকে অধিকার করতে।

এজরা পাউণ্ডের বক্তব্য যেন তারই পরবর্তী ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণ, যখন তিনি বলেন (১৯১৪): আমাদের সুযোগ লিওনার্দোর চেয়েও বেশী: আমাদের অনেক বেশী খাদ্যগ্রাহী প্রত্যঙ্গ ; একটি মাত্র ধ্রুপদী ঐতিহ্যকে পুনর্জীবিত করার দায় আমাদের নেই—আমাদের রয়েছে মহাচীন ও মিশর এবং পৃথিবীর ছাদের উপরে ছড়ানো অজস্র অজানা দেশ—খোটান কারাশার ও কান-সু।

এই ঘোষণাবলীর যাথার্থ্য সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান নই, তবে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যও এ ব্যাপারে একটি প্রধান কারণ তা'ও ঠিক। অন্যান্য দেশে, অর্থ-হীনতাই কি প্রতিবন্ধক? তা মনে হয় না। বরং মনে হয়, আবশ্যকতা-বোধের অভাব। কিন্তু সভ্যতার খাতিরে এমন অনেক কিছুই তো করতে হয়, যা নিষ্প্রয়োজন।

স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক-প্রেক্ষিত তুলনামূলক সাহিত্য অনুশীলনের জন্য বিশেষ উপযোগী, এ আমার ব্যক্তিগত ধারণা। তার কয়েকটি কারণ আছে ; প্রথম, বলতে ইচ্ছে হয়, আমেরিকার মতোই, আমাদের ক্ষেত্রেও কোনো সুনির্দিষ্ট ঐতিহ্যের চাপ ও দাবি অনুপস্থিত। গোটা বাংলা সাহিত্য অবশ্য আমাদেরও ঐতিহ্য ; কিন্তু তা কিঞ্চিৎ দূরবর্তী এবং সংলগ্ন: তার দিকে, বিদেশী ভাষার চেয়ে আরো একটু গভীর করে আমরা তাকাতে পারি মাত্র। বিগত পঁচিশ বছরে, এমনি আলাদা রাষ্ট্রীয় পরিবেশে আমাদের যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তার স্বাতন্ত্র্য, সৌন্দর্য ও প্রগতিশীলতা ভবিষ্যৎমুখী ; এবং মুক্তিযুদ্ধের মানসিকতা ও শিক্ষা তাকে আরো মৌলিক শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমতাবস্থায়

অত্যন্ত সহজে আমরা বাইরের পানে তাকাতে পারি। পৃথিবীর সমস্ত সেরা ভাষা ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের ধারায় অবগাহন করবার প্রেরণা রয়েছে আমাদের অস্থিমজ্জায়, রক্তধারায়। দ্বিতীয়ত, নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে আমাদের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ; এবং ক্রমে ক্রমে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক'ও গড়ে উঠবে এদের সঙ্গে। অতএব সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পারস্পরিক যোগাযোগ অনিবার্য। এবং এও বোধ হয় সত্য যে, বাংলাদেশের সাহিত্য হিসেবে ওসব ভাষায় অনূদিত হবে গত পঁচিশ বছরেরই বাছাইকরা বাংলাদেশ-সাহিত্য এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত রচনাবলী। তৃতীয়ত, বিপুল রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আমরা জন্মেছি, সুতরাং আন্তর্জাতিক মানবমুখিতা আমাদের অনুশীলনের জিনিস, আয়ত্তের জিনিস। পাশ্চাত্ত্যকে আমরা ধারণ করবো, এবং প্রাচ্যকেও ; পাশ্চাত্ত্যের জীবনতৃষ্ণার সঙ্গে প্রাচ্যের মরমীয়তাকে সমন্বিত করার সুযোগ আমাদের সৃষ্টিশীলতার মধ্যেই সবচেয়ে বেশী।

মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বলা যায় যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত, উনিশ শতকে তার উৎপত্তি এক অবিরত অখণ্ড তুলনাশীলতার মধ্যদিয়ে। সেই পট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো যে, তুলনামূলক সাহিত্যের চরিত্রের সঙ্গে, আমাদের অজ্ঞাতসারে, ইতিমধ্যেই আমরা জড়িত।

১৯৭৩

র্যাবো কিংবদন্তী

রঁ্যাবো এক বিস্ময়কর শিল্প অথবা শিল্পের বিস্ময় তা বলা মুশকিল। কারণ যেখানে সংকেত ইশারা রহস্য সেখানে উপসংহার অনন্ত, এবং খোদ ফ্রান্সে রঁ্যাবো-অনুসন্ধান, রঁ্যাবো-ব্যবচ্ছেদ, রঁ্যাবো-বিতর্ক সাহিত্যক্ষেত্রে এখনো জ্বলন্ত উদ্যোগ, যার শেকড়কাণ্ড, ডালপালা পত্রগুচ্ছ নতুন নতুন প্রশ্নের দিকে বাড়ছে। বিচার-বিশ্লেষণ, টীকা টিপ্পনী। অনুমান অসিদ্ধান্ত। কিন্তু সব-কিছু মিলিয়ে যার নির্মাণ তা কাব্যকীর্তি নয়, কিংবদন্তী, রঁ্যাবো যেন এক বর্দ্ধিষ্ণু উপাখ্যানের কেন্দ্রীয় চরিত্র, রূপকথার নায়ক।[১] তিনি কি লিখেছেন তা বৃহৎ জিজ্ঞাসার উপলক্ষ এবং উপাদান, অন্তিম নয়। প্রস্তুতিকাল ছিলো যদিও, গোটা তিন বছর প্রকৃত সাহিত্য-জীবন এবং মাত্র কুড়ি বছর বয়েসেই তার চিরপরিসমাপ্তি ; মোট শস্য দু'টি ছোটো কাব্য এবং কিছু খণ্ড-কবিতা, চিঠিপত্র এবং একটি জবানবন্দী।[২] অথচ রঁ্যাবো মিথে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন : এর কারণগুলো, হতে পারে অস্পষ্ট, এবং স্বাভাবিকভাবেই কখনো কখনো, দুর্বোধ্য ; কিন্তু অবশ্যই বিশ্লেষণযোগ্য।

সবচেয়ে বড়ো কারণ যেজন্য রঁ্যাবো আশ্চর্য তা হোলো অতি অল্প বয়েসে তার মানসিক পরিপক্কতা (maturity) যা প্রায় অবিশ্বাস্য : অবশ্য

---

[১] Cazamian, L., A History of French Literature, Oxford University Press, 1966, পৃ: ৩৮৪

[২] Rolland de Reneville & Jules Monquet : Rimbaud, Pleiade Edition.

পনেরো বৎসর বয়েসে লাতিন কবিতা পুরস্কারলাভ অলৌকিক কিছু নয়, যেহেতু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই একটি নজির আমরা জানি, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী রবীন্দ্রনাথের ষোলো বৎসর বয়সে লিখিত।[৩] কিন্তু যে কিশোর সতেরোতে একাধারে কবি, দার্শনিক নন্দনতাত্ত্বিক, এবং বিপ্লবী[৪] সে প্রচুর জল্পনাকল্পনার প্রশ্রয় দেবে বৈকি। কবি—পঞ্চাশোর্ধে যে পরিণতি লাভ করবে তার শিক্ষানবিশী বালক সংস্করণ নয়, বরং ষোলোতে 'সংবেদন' 'ওফেলিয়া' এবং 'সূর্য ও মাংস' এবং সতেরেতে 'বিদীর্ণ' 'প্রতারিত প্রাণ' এবং 'মাতালতরণী'র কবিতা; এবং আঠারো উনিশে 'উজ্জ্বলন' আর 'নরকে একঋতু'র মতো কাব্যের স্রষ্টা।[৫] দার্শনিক—সতেরোতেই যার দ্রষ্টা হওয়ার সাধনা পরমকে পাওয়ার জন্য: নন্দনতাত্ত্বিক প্রাচীন গ্রীক থেকে বোদলেয়র পর্যন্ত, কাব্যধারার বিশ্লেষণ তার অনায়াস আয়ত্তে এবং যে বলতে পারে: কবি নিজেকে দ্রষ্টা (Voyant) করে তোলে সকল ইন্দ্রিয়ের এক দীর্ঘ অত্যদ্ভুত এবং যৌক্তিক বিকলিকরণের মধ্য দিয়ে। সকল আকৃতির প্রেম, যন্ত্রণা এবং বিকার তার কাম্য; সে নিজেকে অন্বেষণ করে, তার মধ্যে সকল গরলকে করে সে আত্মসাৎ, রাখে শুধু নির্যাসটুকু। এ এক অকথ্য নির্যাতন যখন তার অগাধ বিশ্বাস ও অতিমানসিক শক্তির প্রয়োজন; এবং যখন সে হয় দুরারোগ্যতম রোগী, ভয়ঙ্কর পাপাচারী, চির-অভিশপ্ত এবং এক মহত্তম জ্ঞানী, মানুষের মধ্যে। কারণ সে তার আত্মার অনুশীলন করেছে---পৌঁছেচে অজানায়।[৬] এগুলো একটি ইঁচড়ে পাকা ছেলের বদহজম করা আপ্তবাক্যের উদ্‌গিরণ নয়; বরং যা লিখেছেন, নিজের উপরেও তা প্রয়োগ করেছেন। প্রকৃত কবি হওয়ার জন্য তাঁর সে কার্যাবলী এক বিচিত্র কাহিনী। এবং র‍্যাঁবো বিপ্লবী: যে পরিচয় তার সমগ্র জীবন; পারী-কম্যুনের আদর্শে উদ্দীপ্ত মফস্বল থেকে নগরের পথে পদাতিক

---

[৩] মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার: **রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক**, পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৩, পৃঃ ৬১

[৪] Cazamian, L, ঐ, পৃঃ ৩৮৪

[৫] Bernard, Oliver, Rimbaud, Penguin Books, 1969, পৃঃ XVI—XIX

[৬] ঐ, পৃঃ ১০-১১.

কিশোর ঃ এবং শুধু সাম্যবাদী শাসনতন্ত্রের রচয়িতাই নয়, প্রচলিত রীতি-নীতি, এমন কি ধর্মের বিরুদ্ধেও সোচ্চার বিদ্রোহী ।

চারাগাছে মহীরুহ ; তার ফুলপাতা ফল আন্দোলন সময়ের শত বছরের দূর থেকে ব্যতিক্রম-বৈশিষ্ট্যের দরুনই নিরন্তর ঔৎসুক্য ও জল্পনাকল্পনায় জড়াবে, তা স্বাভাবিক । কিন্তু, উপরোক্ত সত্যের সঙ্গে অন্য কয়েকটি বাস্তব কারণও স্মরণীয় যেমন তার মধ্যে অন্যতম, র‍্যাঁবো-ভেরলেন সম্পর্ক । এই সম্পর্কের সূত্রপাত

ক্রমবিকাশ ও পরিণতি এমন রোমাঞ্চকর ও নাটকীয় যে, এ সম্পর্কে ঘটনার কঙ্কালকে ঘিরে পণ্ডিত-অপণ্ডিতের অনুমান-আবিষ্কারের শেষ হচ্ছে না । যখন প্রথম পরিচয় এবং সাক্ষাৎ র‍্যাঁবোর বয়েস তখন সতেরো এবং ভেরলেনের সাতাশ । তারপর গৃহবিবাদ ঃ অষ্টাদশী, অসুস্থ স্ত্রীকে পিছনে ফেলে র‍্যাঁবোকে নিয়ে ভেরলেনের প্রথমে বেলজিয়াম এবং পরে ইংলণ্ড প্রবাস । র‍্যাঁবো-ভেরলেন সম্পর্ক কি পবিত্র ? র‍্যাঁবো-ভেরলেন সম্পর্ক অপবিত্র ? ভেরলেন কেন ছেড়ে গেলেন তার নবপরিণীতা বধূকে ? র‍্যাঁবোকে কেন গুলী করলেন ? অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা ; যদিও, র‍্যাঁবো-ভেরলেন সম্পর্কের প্রকৃতি নির্দেশক নিখুঁত দলিলের অভাব নেই । ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক ; এবং অনেকটা মুখরোচক, তাই হয়তো বা উপাখ্যানের উপাদান ?

উপরন্তু, আরেক ধাঁধাঁ গুলীবর্ষণ ঘটনার পর-পরই র‍্যাঁবোর চিরতরে সাহিত্য পরিত্যাগ ; এমনকি, নরকে এক ঋতু (**Une Saison en enfer**), যাকে তিনি বেলজিয়ামে ছাপবার ব্যবস্থা করেছিলেন (১৮৭৪), তারও খোঁজ করলেন না ঃ লেখকের আধডজন কপি ছাড়া সব প্রেসেই রইলো পড়ে, শুরু হোলো র‍্যাঁবোর বিচিত্র আত্মত্যু

প্রবাস ও অন্বেষণ । সাহিত্য পরিত্যাগের (১৮৭৪) পর আরো প্রায় সতেরো বৎসর তিনি বেঁচে ছিলেন ; কিন্তু আর কোনদিন কবিতা লেখবার চেষ্টাও করেননি ঃ এ কি অদ্ভুত কাণ্ড আবিসিনিয়ায় ইউরোপীয় বণিকেরা তার প্রথম যৌবনের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করলে সেগুলোকে র‍্যাঁবো বললেন, 'নিরর্থক । হাস্যকর । বিরক্তিব্যঞ্জক !' কে এই ব্যক্তি ? নিশ্চয় অন্য কেউ, জঁ নিকোলা আর্তুর র‍্যাঁবোর শরীরে যার অবস্থান ; কিন্তু সে কেন

ভুলেছে তার পূর্বপরিচয়? এটা কি সত্যই সত্যদর্শন? অথবা অন্যকিছু? এর জবাব সহজ নয়। তবু চেষ্টা হয়েছে, এবং এখনো হচ্ছে রহস্য উদ্ঘাটনের, যার অন্যতম একটি মতবাদ—কবিতা র‍ঁ্যাবোর কাছে কেবল শিল্প নয় বরং জাদু ও রসায়ন, যার মাধ্যমে পরমকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন অথচ এটা তো সত্য যে, কবিতা ভাষাশিল্প; এবং সে হিসেবে সীমাবদ্ধ। 'হাশিশের ধূমপান করে শাদাচাঁদ কালোচাঁদ' দেখা যেমন পরমকে পাওয়া নয়, তেমনি কবিতা যতই সূক্ষ্মই হোক তার মধ্যে অনন্তের ধরা দেয়াও অসম্ভব। সুতরাং বিফলতা। সেজন্য পরিকল্পিত বাস্তব প্রয়োগে যখন তা ব্যর্থ হোলো, তাকে আর আঁকড়ে থাকার মানেই নেই—কেউ কেউ বলেন[৭] এই উপলব্ধিই র‍ঁ্যাবোকে কবিতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছে। 'দার্শনিক স্বর্ণ'কামনা নিরর্থক; তিনি পৃথিবীর দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন সত্যিকার স্বর্ণের সন্ধানে: গেলেন আফ্রিকায়। দ্বিতীয় মতবাদটি এর প্রায় অনুরূপ যার বক্তব্য তাঁর শেষ রচনা 'নরকে এক ঋতু'র মধ্যেই র‍ঁ্যাবো কাব্যপরিণতির চরমে পৌঁছেচেন: হয়তো তিনি ভেবেছেন, ভাষায় এর চাইতে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়, সুতরাং সাহিত্য-বর্জন।

অবস্থাঘটিত প্রমাণাদির ভিত্তিতে তৈরি এই সমস্ত মতামত মূল্যবান নিশ্চয়ই; এবং এতে সত্যতা থাকতে পারে, তাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু স্বীকার না করে উপায় নেই এগুলো প্রধানত অনুমান; এবং সেজন্য খণ্ডিত। শুরুটা প্রচণ্ড বলেই কি শেষটাকে অদ্ভুত ও আকস্মিক হ'তে হবে? উপরোক্ত ব্যাখ্যাবলী অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু শুধু এমনো তো পারে যে, র‍ঁ্যাবোর প্রতি ভেরলেনের যে গুলীবর্ষণ, শুধু এই কারণেই সাহিত্যজগৎ ছেড়ে দিলেন? মানবচরিত্র সম্পর্কে কখনো শেষ কথা বলা যায় না; সুতরাং সবই সম্ভব। এখানে, আফ্রিকায় তাঁর নিয়োগকারী বার্দের কাছে কথিত মন্তব্য স্মরণ করতে পারি: বার্দের এক প্রশ্নের জবাবে র‍ঁ্যাবো বললেন, (১৮৮৫) লাতিন কোয়ার্টারের 'লেখক শিল্পী এবং প্রমুখদের (সঙ্গীতজ্ঞ নয়)' তিনি জানতেন: এবং তারপর তির্যকভাবে শেষ করলেন 'ওইসব পাণ্ডাদের যথেষ্টই দেখেছেন'।[৮]

---

৭. ঐ, পৃ: XXV
৮. ঐ XXXI.

আধুনিক-বুদ্ধিজীবী মন যে ব্যাপকভাবে র‍ঁ্যাবোর প্রতি আকৃষ্ট তার প্রথম কারণ সম্ভবত তাঁর বৈপ্লবিক প্রতিমূর্তি : চিন্তাধারা এবং জীবনাচরণ, উভয়তই এমন স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতা র‍ঁ্যাবো ছড়িয়েছেন তার সমকাল যার পরিচয় রাখেনি ; কিন্তু দূরবর্তী উত্তরকালের চোখে ধরা পড়ছে : আধুনিক শূন্যতা ও আত্মার সংকট র‍ঁ্যাবোতে প্রেরণা খুঁজে পেয়েছে সবরকম প্রতিষ্ঠানকে (**Establishment**) তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে ; এবং অন্বেষণের নমুনা হিসেবে র‍ঁ্যাবো-কৃত আচরণেরও নিয়েছে আশ্রয় । সেজন্য সমকালীন হিপিতন্ত্রের সঙ্গে র‍ঁ্যাবোর মিল যতটা, ততটা আর কোনো কবিরই নয় ; হোতে পারেন তাঁরা 'বড়' কবি । এই প্রবহমানতা শুধু জীবন্ত নয়, বর্ধিষ্ণু ; সুতরাং উপাখ্যানধর্মী : কাজেই র‍ঁ্যাবোকে বুঝবার, কিংবা বুঝতে চেষ্টা করার নিরাপদ মূলনীতি তাঁর জীবন ও কবিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার । পাঠক হবে নিজেই দর্শক এবং বিচারক । ইতিহাসের কঠিন তারিখে যা নির্ধারিত, সেই জীবন সাজানো হোক ; এবং তাঁর রচনাবলী শব্দে শব্দে চরণে চরণে স্তবকে স্তবকে মেলে ধরা হোক । র‍ঁ্যাবোর এবং তাঁর কবিতার স্বয়ং উপস্থিতিই তাঁর প্রকৃত পরিচয়, যা সকল বিবেচনা অনুমান কল্পনা মাপ পরিমাপের ঊর্ধ্বে অস্তিত্ববান ।

১৯৭২

র‍্যাবোর জীবন ঃ রূপরেখা

ফ্রান্সের এক ছোট্ট সবুজ শহর শার্লোভিল, সেখানে নানার বাড়িতে আঠারো'শ' চুয়ান্ন সনের বিশে অক্টোবর তারিখে জন্ম নিলেন জাঁ নিকোলা আর্তুর র‍্যাঁবো। পিতা ফ্রেদেরিক, পদাতিক বাহিনীতে সামান্য সৈনিক থেকে ক্যাপটেন হয়েছেন কিন্তু তার আসল পরিচয় তিনি কয়েকটি সামরিক গ্রন্থের রচয়িতা, যেগুলো অবশ্য পাণ্ডুলিপিতেই সীমাবদ্ধ ছিলো; এবং আল্-কোর-আনের একটি ফরাসী তর্জমাও তৈরী করেছিলেন। সম্পত্তি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ ঘটে, এবং র‍্যাঁবো যখন ছয় বৎসরের শিশু, তিনি ওদের ফেলে চলে যান চিরকালের জন্য।

শার্লোভিলের রোসা বিদ্যালয়ে পড়বার সময়ে (১৮৬২) র‍্যাঁবো লিখলেন প্রথম গল্প 'সূর্য এখনো উষ্ণ'।

শার্লোভিল কলেজে ভর্তি হলেন দশ বৎসর বয়সে, যেখানে আরো বছর তিন বাদে ফরাসী রাজপুত্রের প্রথম কমিউনিয়ন উপলক্ষে রচনা করলেন ষাটটি লাতিন ষটপদী কবিতা। তার এক বৎসর পরেই (১৮৬৯) লাতিন কবিতা প্রতিযোগিতা, র‍্যাঁবো বিজয়ী হলেন, এবং পুরস্কার লাভ করলেন। বয়স, সাড়ে চৌদ্দ বৎসর। প্রতিযোগিতার একটি সুন্দর শব্দচিত্র আছে নিচে তার সংক্ষিপ্তসার দিই:

প্রতিযোগিতার বিষয়ঃ নুমিদিয়ার রাজা, জুগোরআ (খ্রীষ্টপূর্ব ১১১-১০৬)। এমন বিষয়, পরীক্ষার্থীরা দারুণ হতাশ হলো। ওরা বিড়বিড় করছে, এটা আমরা কেউ আশা করিনি। বলছে-ক্ষুব্ধ বিস্মিত বিমর্ষ। কিন্তু র‍্যাঁবো নীরব, ডেস্কের উপরে কনুই, হাতে চিবুক, নিশ্চল। সেও কিছছু লেখেনি, মনে হয় যেন ঘুমুচ্ছে। প্রধান শিক্ষক এলেন। বললেন, কী তুমিও পারছোনা? তবে তুমিও ওদের মত সুন্দর গাধা? মাথায় গোবর? র‍্যাঁবোঃ আমার ক্ষিদে পেয়েছে। ও হ্যাঁ, এটা সম্ভব। তক্ষুণি হুকুম। ঢাকনা-দেওয়া ডিসভরতি খাদ্যবস্তু এলো। প্রকাণ্ড সাইজের কয়েক স্লাইজ রুটি এবং মাখন, তুলে নিলো র‍্যাঁবো। আর সে কি হাসির হুল্লোড়। হল ঘর কাঁপছে। কিন্তু র‍্যাঁবো নির্বিকারঃ খাচ্ছে, কেবল ঠিকরাচ্ছে চোখ-জোড়া; এবং শেষটুকু গিলে ফেলবার পর কলমটা তুলে নিলো হাত বাড়িয়ে এবং একটানা লিখলো লাতিন কবিতা। পরীক্ষা-সময় শেষ হওয়ার অনেক আগেই উঠে মঞ্চের দিকে গেলো এবং কাগজগুলো হাতে তুলে দিলো চতুর চাউনিতে। আশিটি চরণ, পাকা লাতিনঃ সুমুদ্রিত এবং ধ্বনিময়। প্রধান শিক্ষক মহাখুশি, হ্যাঁ কলেজের সম্মান রক্ষার জন্য এ রীতিমত আশাতিরিক্ত।

এ বছরেই, জানার মধ্যে, তার প্রথম ফরাসী কবিতা 'অনাথের নববর্ষ উপহার' লিখিতঃ এটা রেভ্যু পু তুস পত্রিকার দোসরা জানুয়ারী সংখ্যায় ছাপা হয়। তার পরের বছর অলঙ্কারশাস্ত্র শ্রেণী এবং জর্জ ইজামবার্দ, দুই-ই কিঞ্চিৎ উচ্চতর সোপান। ইজামবার্দ তরুণ শিক্ষক, বিপ্লবের রক্ত টগবগ ফুটছে তাঁর ধমনীতে, তিনি র‍্যাঁবোকে রাব্‌লে এবং হিউগো পড়বার প্রেরণা দিলেন। পনেরো বছর বয়সে র‍্যাঁবো পুরোদস্তুর কবি। তিনি থিয়োদোর বঁভিলকে লিখছেন (২৪ মে, ১৮৭০)

ঃ প্রেমের ঋতুতে এসেছি আমরা-আমি এখন সতেরো।[২] লোকে বলে এটা আশাময়, স্বপ্নিল বয়স—এবং আমি, কাব্যলক্ষ্মীর স্পর্শধন্য এক শিশু-ক্ষমা করবেন যদি কথাটা মামুলি লাগে—শুরু করেছি আমার বিশ্বাস, আমার

---

১. **Jean-Maric Carre, La Vie aventureuse de Jeam-Arbur Rimband (Pion, Paris, 1962),**

২. আসলে র‍্যাঁবোর বয়স তখন পনেরো বৎসর সাত মাস।

আশা, আমার আবেগ-অনুভূতিকে রূপ দিতে। এ সবই তো কবির উপযুক্ত এবং আমি একেই বলি, বসন্তকাল।[৩]

এরপর উনত্রিশে আগস্ট, র্যাঁবো তাঁর পুরস্কার-পাওয়া বইগুলো বিক্রি করে দিলেন এবং ইষ্টিশনে গিয়ে চেপে বসলেন পারীর ট্রেনে, ইচ্ছে রাজকীয় সরকারের পতন দেখবেন। পারী অবশ্য পৌঁছলেন ঃ কিন্তু রেলটিকিটের জরিমানা গেলো তেরো ফ্রাঙ্ক। র্যাঁবো গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হোলেন। র্যাঁবো সব লিখে জানালেন শিক্ষক ইজামবার্দকে ; ত্বরিৎ এসে তাঁকে উদ্ধার করলেন ইজামবার্দ, এবং পাঠিয়ে দিলেন দুয়েই তাঁর পাতানো ফুফু জাঁদরে ভগিনীদের কাছে, দেখা শোনার জন্য। র্যাঁবোর মা শুনলেন সব ঃ এবং তাঁর অনুরোধে, র্যাঁবোকে শার্লেভিলে ফিরিয়ে দিলেন ইজামবার্দ। কিন্তু মাত্র দশদিন। দশদিন পর ঘর ছেড়ে পালালেন র্যাঁবো, এবার বেলজিয়ামের দিকে সংবাদপত্রে কাজ নেয়ার জন্য। যদিও সে আশা পূর্ণ হোলো না। এরপর ব্রাসেলস যেখানে ইজামবাদের কয়েকজন বন্ধু থাকতেন, তাদের ওখানে গিয়ে উঠলেন বিনোর্টিশে। তাঁরা আবার তাঁকে দুরেই পাঠিয়ে দিলেন ঃ কিন্তু মা'য়ের অনুরোধ---এবং আবার শার্লেভিল। এই সময়ে, শার্লেভিল ও মেজিয়োর বোমাবর্ষণের তিনি প্রত্যক্ষদর্শী।

শার্লেভিল লাইব্রেরী ঃ
এ কোন্ তেঁদড় ছোকড়া,
পাপিষ্ঠ পাঠক, যে চায় শুধু সমাজতন্ত্র, জাদু ও আলকেমির বই---এবং যাবতীয় অশ্লীল উপন্যাস ?
ইঁচড়ে পাকা বদমাশ, গজরাতে গজরাতে বই সরবরাহ করে গ্রন্থাগারিক,
র্যাঁবো যাদের উপর পরে দাদ নিয়েছেন 'যারা উপবিষ্ট'

কবিতায়। ফেব্রুয়ারী মাসে আবার চম্পট পারীর দিকে, এই নিয়ে তিনবার, কিন্তু এ যাত্রা পক্ষকাল কাটালেন চরম দারিদ্র্যের মধ্যে। অগ্রগামী

---

[৩] থিয়োদোর বঁভিল ছিলেন পারণাস কঁতপরা পত্রিকার নির্বাচনী সংসদের সদস্য ঃ এই চিঠিতে র্যাঁবো তার তিনটি কবিতা সংবেদন ওফেলিয়া এবং সূর্য ও মাংস ছাপবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপি দেরিতে পাওয়ায় বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি।

প্রুসিয়ান সেনাবাহিনীর ভিতর দিয়ে পায়ে হেঁটে ফিরে এলেন শার্লেভিল। ফেরামাত্র র‍্যাঁবো একটি সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র রচনা করেন, কিন্তু তা পাওয়া যায়নি। মে মাসে লেখেন দুটো চিঠি, কবিতাবিষয়ক চিন্তাধারা আলোচনা করে একটি ইজামবার্দের কাছে (মে ১৩, ১৮৭১) এবং আরেকটি দেমেনীকে (মে ১৫), যা লেতর দ্য ভয়ো (Letter du Voyant) নামে বিখ্যাত। র‍্যাঁবো এখন ভয়ানক পাদ্রীবিদ্বেষী এবং খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী। কবিতা লিখছেন, কবিতা পাঠাচ্ছেন। এমনিভাবে ঘটলো সাহিত্য-জগতের সেই বহু আলোচিত বহু বিতর্কিত ঘটনা, যার নাম র‍্যাঁবো-ভেরলেন সম্পর্ক। প্রসঙ্গটি আর-একজন বাঙালী পণ্ডিত[৪] যেভাবে পরিবেশন করেছেন তা চমৎকার, তাই আমি তুলে দিচ্ছি ঃ

'ফ্রান্সে তখন আগুন লেগেছে, পারী-কম্যুনের যুগ। সারাপথ হেঁটে এসেছেন র‍্যাঁবো সেই আন্দোলনে যোগ দিতে। লম্বা লম্বা হাত, গোড়ালির ওপরে ওঠা ছোটো ময়লা প্যান্ট, উস্কোখুস্কো চুল, মুখে প্রকাণ্ড চুরুট আর সেই জ্বলন্ত চোখ। এর আগেও পারীতে এসেছেন। একবার তো বিনা টিকিটে রেল-ভ্রমণের জন্য কারাবাসের দণ্ড পর্যন্ত ভোগ করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে কবিতা লেখা চলছে। একদিন কী খেয়াল হলো, পাঠিয়ে দিলেন কিছু কবিতা ভেরলেনকে, তখনো তাঁকে নামে চেনেন মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো ভেরলেন-এর ঃ প্রিয় বন্ধু, মহাত্মা আপনি এখানে চলে আসুন, পারী আপনার প্রতীক্ষা করছে। চিঠি পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ষোল বছরের কিশোর সেই রাত্রেই লিখে ফেললেন 'মাতালতরণী'। পরের দিন সকালে পারী অভিমুখে যাত্রা। ষ্টেশনে নিতে এসেছেন ভেরলেন, খুঁজছেন হোমরা-চোমরা কাউকে—এই একরত্তি ছেলেটিই যে সেই মহাত্মা তা তিনি কি ক'রে জানবেন? তাকে দেখেও দেখলেন না, ফিরে এলেন ব্যর্থমনোরথ হয়ে। বাড়ী এসে দেখেন র‍্যাঁবো বসে আছেন, পায়ের ওপর পা তুলে চুরুট টানছেন নিস্পৃহ দৃষ্টিতে।

'—ওমেগা, তোমার দৃষ্টি কাঁপে নীল কিরণ-হিল্লোলে।'

সেই প্রথম দর্শনেই বিদ্ধ হলেন ভেরলেন, কি যে দেখলেন তাতে, তা' তিনি নিজেই জানেন না। তাঁর নতুন বিবাহিত জীবন, কবিত্বের খ্যাতি, যা-কিছু

---

[৪] লোকনাথ ভট্টাচার্য, নরকে এক ঋতু, দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৬২, পৃঃ ৬-৭।

অর্জন করেছেন জীবন-ভোর, সবকিছুর কথা ভেবে সংকোচ ও ধিক্কার-মিশ্রিত এক তিক্ততার সমস্ত অন্তর তাঁর কুঁকড়ে উঠলো। পরের দিন সকালে র‍্যাঁবোকে নিয়ে গেছেন এক কাফেতে। র‍্যাঁবো নিচু গলায় প'ড়ে শোনাচ্ছেন তাঁর সবেমাত্র শেষকরা 'মাতাল তরণী'—

নিঃসাড় নদীর জলে ভেসে যেতে তরণ চঞ্চলে
কখন খেয়াল হ'লো গুণটানা মাঝিদের টান
থেমে গেছে—হতভাগ্য, প'ড়ে মত্ত বর্বর-দঙ্গলে
রক্তাক্ত খুঁটির গায় বিদ্ধ তারা, নগ্ন লম্বমান।

প্রথম চারিটি পংক্তিতেই আবিষ্কার করলেন ভেরলেন, এই শিশু 'কলঙ্কিত, অপূর্ব ভীষণে'। তাঁর সমস্ত জীবন উল্টে-পাল্টে গেলো। র‍্যাঁবোকে ভ্রমণের লোভ দেখালেন, বললেন, 'চলো একসঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে বেড়াবো, আমার জীবন ধন্য হবে।' পিছনে প'ড়ে রইলেন নতুন বিবাহিতা স্ত্রী, যাঁর সঙ্গে আর কখনো মানিয়ে দিতে পারেননি ভেরলেন।'

এ-সময়কার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য: লাতিন কোয়ার্টারের কাফেতে সারাদিন এবং রাত্রির অংশ যাপন অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে ভেরলেনের গুরুতর ঝগড়ার কারণ তো হলো বটেই, ভেরলেনের শাশুড়ি র‍্যাঁবোর বিরুদ্ধে ভেরলেনকে নষ্ট করার অভিযোগ আনলেন। অথচ ভেরলেন র‍্যাঁবোর চেয়ে দশ বছরের বড়ো। ইতিমধ্যে, পারীতে র‍্যাঁবো দ্রুত স্থান ক'রে নিয়েছেন। ঝাঁঝালো সুরা এবং হাশিশ দু'য়েরই চর্চা চলছে। যা খুব একটা প্রীতিকর অভিজ্ঞতা নয়: প্রথমবারের সময়, কথিত আছে---ভেরলেন শুধোলেন, কি দেখছো বলো। শাদা চাঁদ কালো চাঁদ---র‍্যাঁবোর উত্তর। এইভাবে, এবং অন্যান্য অনুশীলনের মাধ্যমে পত্রকথিত সকল ইন্দ্রিয়ের বিকলীকরণ ঠিকই চললো। মার্চ মাসে (১৮৭২) র‍্যাঁবো ফিরে এলেন শার্লেভিলের বাড়িতে সম্ভবত ভেরলেনকে স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সুযোগ দেয়ার জন্য কিংবা, ভেরলেনের স্ত্রী যেন এদের বন্ধুত্বকে মেনে নিতে পারে। কিন্তু হোলো না। ভেরলেন ডাকলেন মে মাসে ফিরে যেতে, এবং কথা শুনলেন র‍্যাঁবো।

৫। র‍্যাঁবোর প্রকৃত বয়স তখন ষোলো বছর নয় মাস।

জুনে লিখলেন শেষ ছন্দোবদ্ধ কবিতা ঃ 'স্বর্ণযুগ', 'ক্ষুধাউৎসব' ও 'ঋতু ও স্তম্ভ' ঃ কিন্তু এটা 'উজ্জ্বলন' (Les Illuminations) পর্বেরও শুরু, গোড়ায় যার নাম ছিলো কেবল 'গদ্য কবিতা' (Poems en Prose)[৬] । জুলাই মাসে র‍্যাঁবো আর ভেরলেন বেলজিয়ামের উদ্দেশ্যে পারী ছাড়লেন ঃ সেখান থেকে পাড়ি জমালেন ইংল্যাণ্ডে ; তাঁরা টোটেনহ্যাম কোর্ট রোড সংলগ্ন হাউল্যাণ্ড ষ্ট্রীটে থাকতেন। কাছেই লণ্ডনের বিখ্যাত সোহো এলেকা, যেখানে তখন এসে আস্তানা গেড়েছিলো পারী ও কম্যুনের বামপন্থী রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা। এবং শুধু সোহো নয় লণ্ডন।

মহানগরীর নিচুতলার বিচিত্র জীবনের সঙ্গেও পরিচিত হলেন র‍্যাঁবো এবং ভেরলেন। পয়সাকড়ি নেই, পকেট ঠন্‌ঠন্‌ এবং ভাষা শিখিয়ে যে রোজগার করবেন সে পথও বন্ধ, কারণ একসঙ্গে এত ফরাসী ছাত্র এসে ভীড় করেছে। র‍্যাঁবোর মা জানালেন ভেরলেনের শ্বশুর পরিজন ভেরলেনের স্ত্রীর তালাক নেবার জন্য যে মামলা দায়ের করেছেন তাতে র‍্যাঁবোকেও জড়াতে পারে। মা'য়ের উপদেশে র‍্যাঁবো শার্লোভিল চলে গেলেন বড়দিন কাটাতে।

ভেরলেন লণ্ডনে একা, ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত, তার মা'কে লিখলেন জলদি এসো আমি মরছি। এবং র‍্যাঁবোকে লণ্ডন আসার ভাড়া পাঠাও।

ভেরলেনের মা এলেন, তার দু'দিন পর এসে পৌঁছলেন র‍্যাঁবো। ভেরলেন আরোগ্যলাভ করলেন। আবার শুরু হোলো পূর্বজীবন ঃ পাবচর্চা, রাতের লণ্ডনে হাঁটা ঃ ডক, পূর্ব লণ্ডন শহরতলী। ডক সন্নিকটে চীনা শুঁড়িখানায় এরা আফিম খেতে শিখেছিলেন বলে অনুমেয়। এপ্রিলে (১৮৭৩) র‍্যাঁবো ফিরে গেলেন মায়ের কাছে, তার গোলাবাড়িতে ; এবং তাঁকে সাহায্য করার বদলে ঘরের দরোজা এঁটে দিলেন ঃ লিখতে শুরু করলেন 'নরকে একঋতু' (Une saison en enfer)। মে মাসে ভেরলেন আবার র‍্যাঁবোকে লণ্ডন যেতে বাধ্য করলেন। র‍্যাঁবো রাজী হলেন, কিন্তু শীঘ্রই অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত ঃ ভেরলেনের অতিরিক্ত

৬। লা ইলুমিনেয়ু ভেরলেনের দেয়া নাম, কবিতাগুলোর প্রকাশ সময় ১৮৮ ।

লদকালদকি স্বভাবে তিনি বিরক্ত। কথা কাটাকাটি, নিষ্ঠুরতা। এ সময়ে নাকি র‍্যাঁবো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে দেখা একটি ইংরেজ মেয়ের প্রেমে পড়েন ঃ ওকে তিনি অনুসরণ করতেন; কিন্তু কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলবার সাহস পাননি। যাই হোক, একদিন ভীষণ ঝগড়া হোলো ঃ ভেরলেন ব্রাসেলসে চলে গেলেন র‍্যাঁবোকে ছেড়ে। তার পেছন পেছন গেলেন র‍্যাঁবো—এরপরেই গুলীবর্ষণের ঘটনা; ভেরলেন দুবার গুলী ছুঁড়লেন র‍্যাঁবোকে লক্ষ্য করে, তার একটি র‍্যাঁবোর কব্জিতে লাগলো। র‍্যাঁবো, হাতে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে চলে গেলেন মা'য়ের গোলাবাড়িতে এবং 'নরকে একঋতু' লিখে শেষ করলেন। গুলীবর্ষণের অপরাধে দু'বৎসরের কারাবাস পেলেন ভেরলেন।[৭]

র‍্যাঁবো, বেলজিয়ামে 'নরকে একঋতু' ছাপবার ব্যবস্থা করলেন; কিন্তু শীঘ্রই, সাহিত্যের প্রতি তাঁর আর কোনো আকর্ষণ রইলো না; তিনি সাহিত্য পরিত্যাগ করলেন চিরতরে ঃ লেখকের আধডজন কপি ছাড়া 'নরকে একঋতু' প্রেসেই পড়ে থাকে উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত (১৯১৪)। র‍্যাঁবো তাঁর ইংরেজি পাকা করবার জন্য পারীর তরুণ কবি জারমান নোভোর সঙ্গে লণ্ডন চলে গেলেন। ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের নানা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করেন জীবিকা নির্বাহের জন্য। দু'বন্ধুরই ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর পাঠক-টিকিট ছিলো। এই সময় র‍্যাঁবো, সম্ভবত একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করেন।[৮]

পরবর্তী ছয় বৎসর (১৮৭৫-৮০) র‍্যাঁবো যাযাবর, ভ্রাম্যমাণ। তিনি দেখেন জার্মেনী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী। জার্মান স্পেনিশ আরবী ইতালীয় ডাচ ও আধুনিক গ্রীকভাষা পড়েন। ছয় বৎসরের চুক্তিতে দিনেমার ঔপনিবেশিক সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন; কিন্তু সপ্তাহ তিন পরেই ইষ্ট ইণ্ডিজের ব্যাটাভিয়াতে চাকরি ছেড়ে দিয়ে একটি ইংলিশ সামুদ্রিক জাহাজে করে ফিরে এলেন ফ্রান্সে, ভর্দো থেকে হেঁটে পৌঁছলেন বাড়ি।

৭। বাংলাভাষায় এর নির্ভরযোগ্য তরজমা করেছেন লোকনাথ ভট্টাচার্য—'নরকে একঋতু'—ঐ।

৮। Oliver Bernard, Rimbaud, Penguin Books 1969.

এরপর র‍্যাঁবো ভিয়েনা হল্যাণ্ড সুইডেন ডেনমার্ক ভ্রমণ করেন। ১৮৭৫-এর গোড়ার দিকে র‍্যাঁবো ও ভেরলেনের মধ্যে শেষ সাক্ষাৎকার। ক্যাথলিক ধর্মমতে পুনর্দীক্ষিত ভেরলেন র‍্যাঁবোকেও তাই হোতে আকুল আবেদন জানালেন। কিন্তু র‍্যাঁবো মানলেন না। এ বিষয়ে র‍্যাঁবো বলেছেন, 'ভেরলেন এলো খাবার মধ্যে ফুল দিয়ে।' পুরনো ঢংয়ে মদ্যপান করলেন দু'জনে: কিন্তু অনুমান, এতে 'পুরনো ক্ষতগুলোই আবার রক্ত ঝরালো'; এটা ঘটে স্টুটগার্টে। র‍্যাঁবো এখন সুদুরের পিয়াসী: মার্সেঁলি থেকে আলেকজান্দ্রিয়া: নামলেন সিবিতা ভিচ্‌চার্‌; এবং তারপর রোম। শীতকালে ফিরলেন শার্লেভিল। কিন্তু স্বপ্ন তার প্রাচ্যভূমি: পরের বসন্তে পুবে মেলা দিলেন হামবুর্গ থেকে, যে-চেষ্টা ব্যর্থ হোলো। কিন্তু অক্টোবরে পাহাড় ডিঙোলেন, প্রথমে সুইজারল্যাণ্ড পরে ইতালী; এবং সেখান থেকে নৌকায় আলেকজান্দ্রিয়া। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে একটি কাজ জোগাড় করলেন সাইপ্রাসে, কিন্তু টাইফয়েড হোলো। ফলে শার্লেভিলে ফিরে এলেন (জুন, ১৮৭৯) এবং শীতকাল কাটালেন। কিন্তু পরের বছর (১৮৮০) আবার সাইপ্রাস। গভর্নর-জেনারেলের বাড়ি তৈরীর কাজে ব্যস্ত। আবহাওয়া সহ্য হলো না। মিশরে এলেন। মিশর থেকে এডেন। এখানে একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পেলেন যাদের ব্যবসা কফি ও চামড়ার। কর্মকর্তারা র‍্যাঁবোকে আবিসিনিয়ার হ্যারারে তাদের নতুন অফিসে পাঠালেন; র‍্যাঁবো কুড়িদিনে, ঘোড়ার পিঠে করে সেখানে পেঁছিলেন সোমালী মরুভূমি দিয়ে (১৩ ডিসেম্বর)।

বার্দী প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা, কিন্তু র‍্যাঁবোর চোখে আবিষ্কারের স্বপ্ন। তিনি, মাকে লিখে ফ্রান্স থেকে কারিগরি পুস্তকাবলী ও ছবি তোলার যন্ত্রপাতি আনালেন। সোমালীল্যাণ্ড ও গালায় অনুসন্ধান চালাবার জন্য নিয়োগকারী নির্দেশ দিলে সেগুলো ছাড়াও নিজের উদ্যোগে সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চল ও গ্যাদিন সম্পর্কে তথ্য আহরণ করলেন, এবং এই এলেকার অনুপ্রবেশে সক্ষম তিনিই প্রথম ইউরোপীয়। সুসিতি দ্য জিওগাফীর কাছে একটি বিবরণী পাঠালে তারা সেটা প্রকাশ করেন। মনিব আলফ্রেদ বার্দীর সঙ্গে অনেক সময় বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হোত, কিন্তু বিষয়

আর যাই হোক, সাহিত্য নয়। লণ্ডনের কথা উঠলে একদিন মন্তব্য, 'ওটা ছিল মাতলামীর পর্ব।' একটি লম্বা ঋজু, আবিসিনীয় মেয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধেন: কিন্তু কিছুদিনেই ইতি। এবং সেজন্য সংসার বর্জন, সেই বন্দুক ব্যবসাও সফল হোলো না। এরপর তাঁকে আমরা অর্থোপার্জনের আরো নানা উদ্যমে দেখতে পাই; কিন্তু ব্যবসা-বুদ্ধির অভাবে জমলো না কিছুই। ফেব্রুয়ারী মাসে (১৮৯১) ডান হাঁটুতে টিউমার হলো: ফ্রান্সে ফিরে এলেন র‍্যাঁবো এবং হাপিতল দ্য লা কনসেপসতে ভর্তি হোলেন। সেখানে থেকে এসে কয়েক মাস বাড়িতে কাটালেন: কিন্তু আগস্টের দিকে অবস্থা খারাপ হোলে আবার হাসপাতালে চলে গেলেন। সেখানে দশই ডিসেম্বর (১৮৯১) তারিখে মৃত্যু।

১৯৭২

নতুন কবিতার ইশতেহার

নতুন কবিতা জন্ম নেবেই, অরণ্যে যেমন আসে সবুজ পাতার জোয়ার, আসে নতুন পাখিরা, নতুন বসন্ত; প্রকৃতির নতুন নতুন জাগরণের মতো এও, অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য একটা শর্ত ঃ যদি সেই জাতি বেঁচে থাকে এবং বেঁচে থাকে তার ভাষা। কোনো প্রচণ্ড প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা ভয়ঙ্কর যুদ্ধে, কোনো জাতি এমনভাবে ধ্বংস হোতে পারে যার পরে জীবিত অবশিষ্ট সদস্যরা হোয়ে থাকে বহুকাল পর্যন্ত অথর্ব ও বন্ধ্যা; এবং বাইরের উন্নততর শক্তির প্রভাবে বা অধিকারের ফলে, কোনো জাতির ভাষাও হারাতে পারে তার সজীবতা ও প্রগতি।

দেখলেই চিনতে পারি, না দেখলে নয়; এবং না আসা পর্যন্ত তো দেখাও অসম্ভব। তবু যার নাম শুনেছি, যার মতো অন্য কাউকে দেখেছি অন্য কোনো সময়ে তার সম্পর্কে অগ্রিম কিছু ধারণা থাকতে পারে, যা হয়তো একান্ত অবাস্তব নয়। আমার তো মনে হয়, নতুন কবিতার প্রথম লক্ষণ, অপূর্বতা। এবং অপূর্ব এ কথাটাকে, আমরা একটি বিচিত্রিত চাকার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দেখতে পারি। অপূর্ব এই নিশেনকে, এই আন্দোলিত পুষ্পস্তবককে সম্ভব করে বহুতর রেখা, যারা এই চাকার সব জায়গা থেকে এসে মিলেছে একজায়গায়; এবং সেইসব রেখা আবেগ

অনুভূতি চিন্তাধারা ভাষ্য শব্দ ছন্দ স্তবক উপমা রূপক প্রতীক অলঙ্কার। এই অপূর্বতা একদিকে একক, অন্যদিকে সাধারণ। এর অর্থ, এই সময়ের ভিন্ন ভিন্ন কবিতায় সে থাকে জড়িয়ে আবার সামগ্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ কবিতারও সে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কথাটাকে, আরেকটু বিশদ করে বলা যেতে পারে, একজন কবি বা কয়েকজন কবির রচনায় দেখা দেয় এই অপূর্বতা, যা ক্রমে ক্রমে সমগ্র কাব্যধারায় সঞ্চারিত হয়ে যায় অবশ্য, ঐতিহ্যানুসারী ধারার একটা অংশ প্রবাহিত থাকে একই সঙ্গে যদিও সমান্তরাল নয় কিঞ্চিৎ দূরবর্তী।

যে ঋজু মানসিক বেগ অপূর্ব তাকে সম্ভব করে তার নাম দিতে পারি, রুচি। এই রুচিও একদিকে ব্যক্তিগত, অন্যদিকে সমষ্টিসম্মত। সমাজের রুচি পরিবর্তনের জন্য দায়ী যে বহুমুখী ও বিভিন্ন শক্তির লীলাখেলা তাকে প্রণালীবদ্ধ করা কঠিন কিছু নয়, যদিও জটিল। স্থূলভাবে বলতে গেলে, উৎপাদন, যন্ত্রপাতি ও উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন মৌলিক রুচিবদলের একটি ভিত্তিগত শক্তি; কারণ এই পরিস্থিতি ব্যক্তিসম্পর্ক ও শ্রেণীসম্পর্কে নতুনত্ব আনে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা উদ্যমে আরোপ করে নতুন নতুন মাত্রা। ভূমিনির্ভর সামন্তযুগের অবসানে পুঁজিতন্ত্রের আবির্ভাবের মধ্যে তা সহজেই লক্ষণীয়। ইউরোপীয় রেঁনেসার স্বপ্ন ও সাধনা এক ব্যাপক রুচিবদলের আন্দোলন ছিলো বৈকি। বণিকপুঁজির সচলতা ও বন্ধ্যাত্ব দুই-ই যুগপৎ কাজ করেছিলো উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাংলা সমাজ ও তার শিল্প-সাহিত্যের উত্তরণের সময়। ভারতচন্দ্র থেকে মধুসূদন কালের পরিধি বেশী নয়, কিন্তু উভয়ের মধ্যে দূরত্ব অসামান্য। বিদ্যার বিপরীত বিহার মধুসূদনের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিলো না; এবং ভারতচন্দ্র লিখতে পারতেন না সোমের প্রতি তারা কাব্যপত্র। এ দুয়ের রুচিগত ভিত্তি ও স্বাদ আলাদা, সমসাময়িকতার নির্যাস থেকে যাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের কাছে উদ্ভট উর্বশী ও আর্টেমিস এবং পল্লীসমাজের লেখক পুতুলনাচের ইতিকথা দেখে চমৎকৃত হোতেন নিশ্চয়ই। এই সত্য থেকে একটি অনুসিদ্ধান্ত করতে পারি আমরা এবং তা হোলো ভাবীকালের অপূর্বতা সমকালীন লেখকের অনায়ত্ত।

তা'হলে, এখানে প্রশ্ন জাগে, নতুন কবিতার অপূর্বত' কি একান্ত আগন্তুক বস্তু, কখনো যার অস্তিত্ব ছিলো না? এর জবাব সহজ। আমরা জানি, আকাশকুসুম আকাশকুসুমই—তা দিয়ে পুষ্পমালা তৈরি হয় না। তেমনি শিল্পের, সাহিত্যের অপূর্বতার মানে আজগুবি কিছু নয়, বরং তা চলতি স্রোতোধারার মধ্যেই নতুন আবিষ্কার। নতুন উজ্জীবন। নতুন উদ্ভাসন। উর্বর ঋতু, বাগান আছে; অনুকুল হাওয়া বইছে—ফুটেছে রংবেরংয়ের ফুল, পাতা লতাগুল্ম। এইসব থেকে সুন্দর স্তবক কি মালা যে রচনা করতে পারে তার নাম মালাকর। বাগানটা প্রাকৃতিক, মালা মানবিক। এবং নিঃসন্দেহে ব্যক্তির অবদান। মাল্যরচনার তাগিদ সে লাভ করে সমাজ থেকে, যার মূলে এমনকি থাকতে পারে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি এবং সে লাভ করে নতুন ধরনের মাল্যরচনার প্রেরণাও: কিন্তু রচনার কাজটা তার নিজের। এখানেই শিল্পী অন্য একটা শৃঙ্খলার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, যার নাম সৌন্দর্যতত্ত্ব।

অতএব আমরা বলতে পারি, রুচি জিনিসটা সমাজের কিন্তু সে রুচিকে কখনো অনুসরণ আর কখনো উচ্চকিত করে যে শৈল্পিক অপূর্বতার নির্মাণ সে দান ব্যক্তিপ্রতিভার। আধুনিক কবিতার ভিত্তিভূমি যে রুচি তা সামাজিক হোতে পারে কিন্তু সর্বজনীন মোটেই নয় - বরং এর উৎস ধনতন্ত্রী সভ্যতার সংকট ও টেকনোলজির মানব-বিচ্ছিন্নতা এবং একপ্রকার শূন্যতা-জনিত বৈদগ্ধ্য। এর শেকড় ও শাখাপ্রশাখা অবশ্যই পশ্চিমা শিল্পসমাজের মধ্যে; কিন্তু তার বিশ্ববিস্তারও নিতান্ত প্রাসঙ্গিক। পাউণ্ডের ইমেজিজম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের শুরুতে দানা বাঁধতে থাকে, এবং তার মধ্যে কবিতার পালাবদলের সচেতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর হতাশা ও বিষাদের বীজ তার দর্শনের মধ্যেও নিহিত ছিলো। এলিঅটের পতিত জমি ধ্বংসোন্মুখ সভ্যতার রূপক হোতে পারে; কিন্তু তার আঙ্গিক ও শৈলীগত বিবরণ এবং কিংবদন্তীচারিতা নতুন অপূর্বতার ইঙ্গিত আনলেও, যুগপৎ তা সংকট-নির্দেশকও বটে। তিরিশের বাংলা কবিতা যথাযথ অর্থেই রবীন্দ্রোত্তর যার অনুশীলনগত আপাত কৃত্রিমতাকে দেশজ আর্থনীতিক দুঃস্থতা ইউরোপীয় ধারার সঙ্গে প্রায় সমান তারে বেঁধে দিয়েছিলো।

তিরিশের কবিদের ব্যর্থতা অনেক, সাফল্য অনেক। তাদের ব্যর্থতা তাঁরা মূলত কালের সন্তান, এবং সাফল্য, তাঁরা অনেক পরিশ্রমে নতুন কবিতার জমি তৈরি করে দিয়েছেন।

বাংলা নতুন কবিতার জন্মলগ্ন বেশী দূরে নেই এইকথা যখন বলি তখন আমার চোখে, আমার কানে, আমার-চেতনায় সেই আগামীরই ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। হালের কবিতা দুই চরমের মধ্যে ওঠানামা করছে—একদিকে পদ্যসংবাদিকতা সম্ভবত মালার্মে একেই বলেছিলেন প্রতিবেদন (reportage) এবং অন্যদিকে অনর্গল অবয়বহীনতা। কবিতার সংবাদিকতা অবশ্যই তার সজীব অস্তিত্বের প্রমাণ কিন্তু তার ঐকান্তিকতা ভ্রান্ত উদ্যম; তেমনি কবিতাকে শূন্যতার গর্ভে নিক্ষেপ করার অর্থও কবিতার মৃত্যু। এই দুই রীতিই বিচ্ছেদধর্মী, যোগাত্মক নয়; কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতা তো সর্বদাই এক উত্তরণ? কবিতার সপক্ষে (A Defence of Poetry) প্রস্তাবের এক জায়গায় শেলী বলেছেন, সকল মহৎ কবিতাই অনন্ত: তা যেন প্রথম ওক বৃক্ষের বীজ যার মধ্যে সকল ওকই রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হোতে পারে; কিন্তু অর্থের অনাবৃত অন্তরতম সৌন্দর্য কখনো প্রকাশিত হবে না। শ্রেষ্ঠ কবিতা যেন এক ফোয়ারা, নিত্যকাল তা থেকে প্রজ্ঞা ও আনন্দের বারিধারা উৎসারিত হচ্ছে; এবং এক ব্যক্তি ও এক যুগ তার বিশিষ্ট সম্বন্ধানুযায়ী এর দিব্য প্রভাব নিঃশেষে গ্রহণ করলেও, আর এক এবং তারপর আর এক যুগ আসে, নতুন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—তা এক অদৃষ্টপূর্ব এবং অচিন্তিতপূর্ব আনন্দের উৎস।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, নতুন কবিতার অঙ্গীকার একপ্রকার প্রত্যাবর্তন: শেলী-বর্ণিত ফোয়ারাতত্ত্ব যাতে সহজেই গ্রহণযোগ্য। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরে হোয়েছে বিজ্ঞান বিস্ফোরণ, এবং বিজ্ঞানের আরো অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী; তার মানে মানুষ ক্রমেই আরো বেশী করে অগ্রসর হচ্ছে টেকনোলজি সভ্যতার দিকে। এর অর্থ কি হৃদয়াবেগের, মানবীয় উত্তাপের ক্রমশ বিয়োগ? এরপর কি বিশিষ্ট প্রয়োজন মতো পরিকল্পনা অনুসারে শিশু উৎপন্ন হবে ল্যাবোরেটরীতে? প্রেমের দরকার নেই; নেই বিরহের প্রয়োজন? সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না পাপ অপরাধ স্খলন বিচ্যুতি সব অনাবশ্যক, জীবনের নিম্নতর স্তরের লক্ষণাবলী?

এই যদি হোতে থাকে এই প্রবণতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোও কবিতার কাজ, সুতরাং কবিতা সেখানে সংগ্রাম। মূর্ত কবিতার (Concrete Poetry) নমুনা আমরা দেখেছি, সেগুলো নকশামাত্র এবং টাইপোগ্রাফী। একটি পরীক্ষা হিসেবে বিবেচিত হোতে পারে, কিন্তু, কবিতার মূলধারা নয়। কারিগরি ক্ষমতার নিপুণতম বিকাশে আমরা নিজেরাও যন্ত্র হয়ে যাবো এবং মাটির ভাষার স্থূলত্বকে বিসর্জন দেবো, ঐ আশংকা যারা করেন তাঁরা মারাত্মক ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হোতে পারেন; কিন্তু দারুণ নৈরাশ্যবাদী। আমরা ফিরে যাবো ধূলিমাটি আঁতুড়ঘরে, পৃথিবীর আদিম স্বচ্ছতার দিকে, যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু।

নতুন কবিতার মধ্যে আদিম স্বচ্ছতার আবিষ্কারের অর্থ কি প্রাচীনত্বে প্রত্যাবর্তন? এবং আমাদের এতকালের যে অর্জন, সভ্যতা ও বৈদগ্ধতাকে অস্বীকার? এর জবাব নিশ্চয়ই নেতিবাচক, কিন্তু খুব সরল নয়, কারণ এই অজানা, অনন্ত মহাকালের অবারিত প্রবাহে আমরা যে বিন্দু ছেড়ে আসি তার মধ্যে আর কখনো ফিরে যেতে পারি না, সে যেমন সত্য তেমনি সত্য পরবর্তী রেখায় তার অদৃশ্য অবস্থান। জগতের স্থিরবিন্দু (Still Point) ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, কিন্তু রাতের সকল তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে এই বিবৃতির যথার্থতাকে আমরা সাধারণভাবে গ্রহণ করতে পারি। গীতিকবিতা বোধ হয় সভ্যতার মতোই পুরাতন, এবং মহাকাব্যের যে দর্পণ তা মানব-বিবর্তনের তুলনায় খুব পুরনো না হোলেও, আজকের মুখ দেখার প্রয়োজন তা দিয়েই চালাতে পারি না বলতে পারি। কোনো ক্লাসিকই সমকালীন সৃষ্টিধারার বিরোধী নয়, বরং একটি ভাষায় কোনো ক্লাসিকের অস্তিত্ব সমকালীন সৃষ্টিধারার উৎসের মতো কাজ করে। সাহিত্য আঙ্গিকের সকল ক্ষেত্রে ক্লাসিক-ঐতিহ্য নতুন নতুন রূপান্তরের সাক্ষাৎ প্রেরণা, যেমন এক বসন্তের মধ্যে নিহিত থাকে আর এক বসন্তের বীজ।

পৃথিবীর কবিতার বিভিন্ন ধারা যে দুটি প্রধান খাতে প্রণালীর সীমানা পেয়েছে তা অবশ্যই ক্লাসিসিজম ও রোমান্টিসিজম; কিন্তু ক্লাসিসিজমের বিষয়গত বস্তুবাদী আয়তন এবং রীতির সৌষম্য ও স্থাপত্য-সৌকর্য যেমন সবজায়গায় সমতল নয়, তেমনি নয় সর্বত্র রোমান্টিসিজমের শিখা কেবলই

উর্ধ্বায়িত ঃ শ্রেষ্ঠ রচনায় প্রায়ই দুয়ের সামঞ্জস্য আমরা পাই, যদিও জোরটা একদিকে বেশী। আধুনিককালে দু'য়ের সংমিশ্রণ-বিমিশ্রণ এবং পরস্পর বৈপরীত্য যা এনেছে তা আরেক উত্তরণ, যা কখনো বস্তুবাদী, কখনো প্রতীক, কখনো বা পরাবাস্তববাদী—কিংবা এসবকিছুরই নির্যাস ও সম্মিলন। অর্থাৎ আজকে আমি বাংলাদেশের কবি, বাংলাদেশের মাটিতেই আমি পা রেখেছি একথা ঠিক এবং বাংলাদেশের আলো-হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছি ; কিন্তু আমার চৈতন্য কেবল রবীন্দ্রনাথ কিংবা উত্তর-তিরিশের সাধনার মধ্যে নয়, কবিতার আন্তর্জাতিক স্রোতেও মিশে আছে—আমার যে-কোন যাত্রা এই বিপুল গ্রন্থির মধ্য দিয়েই, তাকে পাশ কাটিয়ে নয়।

এই বৈদগ্ধ্যের ভিতরেই আছে আদিমতার বিভিন্ন খনি, এই জটিলের ভিতরে স্বচ্ছতার হরেক আয়না। বিষয়গত দিক থেকে, আদিমতার অর্থ একদিকে যেমন প্রাচীন সম্মোহন, জিজ্ঞাসা ও আধ্যাত্মিকতার নতুন অনুশীলন, তেমনি অন্যদিকে সংঘাত ও সৃষ্টিময় বাস্তব জীবনের মধ্যে আন্তরিক অবগাহন। এবং শুধু ডুবে থাকলেই চলবে না, কারণ, ডুবে থাকতে পারেন শুধু মুনি ঋষি দরবেশেরা পরমের মধ্যে সমাধি ও নির্বাণই যাদের লক্ষ্য, কিন্তু ফিরে আসতে হবে কবিকে, শিল্পীকে তার অভিজ্ঞতার মনিমুক্তো মানুষকে উপহার দেয়ার জন্য। সে হিসেবে আমি আগে একটি প্রবন্ধে বলেছি, শিল্পমাত্রই প্রত্যাবর্তন এবং কবি শিল্পী বিনোদক নয় অবশ্যই সাধক কিন্তু সাধকের চাইতেও বড়ো। সাধক হোয়েও সাধকের অতিরিক্ত কিছু সে করে, তা হলো রচনা। প্রেমিক প্রেমেই নিঃশেষ হোতে পারেন ; কিন্তু কবিকে শিল্পীকে প্রেমিক হোয়েও প্রেমের উর্ধ্বে ওঠা চাই, যেখান থেকে অন্যের শুধু নয় এমন কি নিজের দুঃখ-বেদনা। প্রবাহকেও নিরাসক্তভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। আধুনিক কবি প্রেমকে ব্যঙ্গ করেন, বিরহ তার হাস্যের কারণ ; কিন্তু নতুন কবির কাছ থেকে আমরা প্রেমের কবিতা চাই সত্যিকারের প্রেমের কবিতা যা রক্তধারার মতো, লাল গোলাপের মতোই তাজা, আগুনের মতো লেলিহান। তখন, প্রেমের কবিতায়, হয়ে উঠবে সে ব্যক্তি, ব্যক্তিগত—যদিও শিল্পী হিসেবে বিষয় থেকে তার দূরবর্তী অবস্থানের গুরুত্ব তখনো ফুরিয়ে যাবে না।

জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যদি আদিমতাকে আমরা খুঁজে পাই তখন প্রকাশের বাহন পাবো সহজেই, যার ভিত্তি হবে সমকালীন চলতি ভাষার ধ্বনিমালা, প্রয়োজনবোধে ঐতিহাসিক ভাষা যা দূরে সংলগ্ন বিমিশ্রিত এবং সজীব। আমার কবিতা তখন আপনার বুকে বিঁধবে তীরের মতো : চীৎকার ক'রে বলতে চাইবেন আপনি---ইউরেকা-ইউরেকা।

পরিহাস ব্যঙ্গোক্তি আত্মজ্ঞান বিশ্লেষণ জটিলতা নতুন কবিতাকে দেবে যে মাত্রা তার মধ্যে কয়েকটি মৌলিক উপাদান আমরা দেখতে পাই : প্রথম, পুরনো মানদণ্ড অনুসারে জীবনের যে রূপকে মনে হয় অতি অকিঞ্চিৎকর এবং কানাকড়ির শামিল তার ভিতরে নাটকীয় অথবা গীতিময় নানাস্রোতের আবিষ্কার, তখন ধূলিবালির মধ্যে আমরা খুঁজে পাবো সোনা, কয়লার আবর্জনার ভিতরে হীরক। এই সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করতে হবে গভীরতম প্রত্যয়ের মতো, যার ফল হবে, কবি বিষয়ের অভাবে কখনো মুষড়ে পড়বেন না – আর কিছু না পেলে ঘরের কোণের ব্যাঙটিকে চেয়ে দেখবেন, কিংবা দেখবেন শাদা দেয়ালের টিকটিকি ও মাকড়শা।

দ্বিতীয়ত, জীবনের স্থূলত্ব ও অশ্লীলতা তার কাছে বর্জনীয় নয়, অভিনন্দনযোগ্য।

আধুনিক কবিতার গ্রন্থচারিতা ও অতিবৈদগ্ধ্য এই উর্বরতা থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে এনেছে, ফলে আধুনিক কবিতা অনেক সময় কেতাবী, বর্ণহীন, নিরক্ত, যার প্রকাশ অনেক কাটাছাটা মাপজোক করা পরিশীলিত ভাষায়। এই শৌখিনতা থেকে কবিতাকে মুক্ত করা নতুন কবিতার এক প্রধান অঙ্গীকার। বাংলা কবিতায় এই ধরনের পিউরিটানিজমের প্রতিষ্ঠাতা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ নয়, এবং তিরিশের কালে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহও আমরা দেখেছি : কিন্তু সেই বিদ্রোহ পুরো সার্থক হয়নি রচনাধারায় ; অবশ্য জীবনানন্দ ব্যতিক্রম। তাঁর মধ্যে সূক্ষ্মতা আছে, স্থূলত্বও আছে, আছে রূপরসের তাজা টাটকা আস্বাদন ; কিন্তু তাঁর মহাজাগতিক দৃষ্টিকোণ ও শূন্যবাদী দর্শন কবিতার বসন্তকে দূর থেকেই শুধু দেখেছে।

তৃতীয়ত, জীবনের সমগ্রতা, নতুন কবিতার অবাধ্য। যে অহংপরায়ণ বিচ্ছেদাত্মক প্রবাহে আমরা ভাসছি তার বাঁধন থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই। আমরা ফিরে যাবো মনস্তাত্ত্বিক ঋজুরেখার মধ্যে, সত্য ও প্রজ্ঞার গ্রন্থিমূলে, যেখানে জীবন হাজারো ঝর্ণায় উৎসারিত, বিস্ফারিত উত্তরঙ্গ। লক্ষ্য আমাদের একদিকে গভীর পাতাল, অন্যদিকে উচ্চতম স্বর্গ; এবং মাঝখানের সকল শিখা সকল আগুনেও পরীক্ষিত সত্তা।

চতুর্থত, আমরা কবি—আমাদের চরিত্র হবে অন্তর্দৃষ্টি সাহস ও স্বাধীনতা।

প্রকৃতপক্ষে এখানেই তো মূল, সুতরাং একে ভালো করে বোঝা প্রয়োজন। অন্তর্দৃষ্টি মানে অতিসাধারণ থেকে শুরু করে জীবনের গভীরতম রহস্যের উন্মোচনের ক্ষমতা ও প্রজ্ঞা। সত্য অনেক সময় নিষ্ঠুর, প্রকৃত অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হলে সেই নিষ্করুণ সত্যের মুখোমুখি হবো আমরা। এই অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য একদিকে যেমন দরকার বিজ্ঞানের অনুশীলন অন্য দিকে তেমনি প্রয়োজন সৌন্দর্যতত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ। সেই সঙ্গে এক সর্বাত্মক সহানুভূতি, যার উৎস নিশ্চয়ই যা-কিছু মানবিক তার প্রতি আস্থা ও প্রেম। এই অন্তর্দৃষ্টির সরস শাঁস থেকেই উৎসারিত হবে আরেকটি গুণ, তা হলো সাহস। সাহস মানে জীবনকে, যতভাবে যেতে পারে এবং উলঙ্গভাবেও, দেখবার বলিষ্ঠতা। এবং সাহস, সত্য-প্রকাশেরও, ভাষার বহুবিচিত্র শিল্পকলার মধ্যে নানা বুননিতে অলংকরণে কিংবা আশ্চর্য ঋজুতায়। এই সাহসের জন্য কবির সঙ্গে বিরোধ বাঁধতে পারে সমাজের, ধর্মের, প্রতিষ্ঠানের, এমন কি সরকার ও রাষ্ট্রের; কিন্তু নতুন কবি, কোন ধ্রুপদী কবিব্যক্তিত্বের মতোই, সত্যের উপরে থাকবে পাষাণপ্রতিম। এইভাবে, অতএব বলতে পারবো নতুন কবি মুক্তির ঝর্ণাধারা, অনবরত শেকলভাঙার সৈনিক, স্বাধীনতার সোনালি রূপালি পাখি। সংগ্রাম করে, কখনো কখনো অবশ্যই রক্তক্ষয়ী, আমরা স্বাধীনতাকে পাবো—প্রতিক্রিয়ার নাগপাশে স্বাধীনতাকে হারাতেও পারি; কিন্তু সে সময় বার বার আমরা ফিরে আসবো নতুন কবির কাছে সেই স্বাধীনতাকে ফিরে পাওয়ার জন্য। স্রষ্টার মতো সেই

কবি শিল্পী এবং কবিতা তার অবিচ্ছিন্ন এক উৎস। এই কবি ডাক দেবে নতুন ঋতুর। নতুন বসন্তের ঃ কারণ তার লক্ষ্য জীবনের স্বাধীনতা, আত্মার স্বাধীনতা।

আমি বাংলাদেশের কবি, কাল ভোরে আমি সেই কবিতার যুদ্ধে নেমেছি।

১৯৭৩